প্রথম সংস্করণ, জুলাই, ১৯৬৭
দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই ১৯৭১

প্রচ্ছদ অঙ্কণে
বিনোদ মণ্ডল

ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা—১ হইতে মোহাম্মদ ওহিদ উল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্যাড়াগণ প্রিন্টার্স, ২৬, কুমারটুলি লেন, ঢাকা—১ হইতে শফিউদ্দিন খান কর্তৃক মুদ্রিত।

বাবা ও মা-কে

পর্বতাভিযানের ঘটনা নিয়ে বই লেখার চেয়ে দুর-দুর্গম হিমালয়ের যে কোন তুষারাবৃত পর্বত শৃঙ্গে আরোহণ করা বোধ হয় সহজতর। অন্ততঃ এ বই লিখতে বসে সে কথাই আমার বার বার মনে হয়েছে। দিনের পর দিন হিম-রাজ্যের চড়াই-উৎরাই ভেঙে শেরপা, নকুল ও কুলীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যে আনন্দের আস্বাদনে এই দুঃসাহসিক অভিযান, তার কথা ভাষায় ব্যক্ত করা রীতিমত এক দুরূহ কাজ। আমি জানি না, পর্বতারোহণের প্রকৃত রোমাঞ্চ, প্রাকৃতিক বিধি-নিষেধ, অভিযাত্রীদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ও মনের বিচিত্র অনুভূতিগুলো আমি কতখানি প্রকাশ করতে পেরেছি এ বইতে। তবে পাঠক-পাঠিকার মনে যদি তার বিন্দুমাত্রও রেখাপাত করতে সমর্থ হয়, তাহলেই আমার এ শ্রম সার্থক হবে।

অনেকের উৎসাহ, প্রেরণা ও সক্রিয় সাহায্যের ফল এই 'মানসী-মানা'। তাঁদের সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের কথা উল্লেখ না করে পারছি না।

প্রথমেই সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি আমার শঙ্কুদার (শঙ্কু মহারাজ) কথা। তাঁর সাহায্য ছাড়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে এ বই প্রকাশ করা দুরূহ হ'ত। আমি তাঁর কাছে চির-ঋণী।

তাঁর পরেই মনে পড়ে তাঁদের কথা যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন—তাঁদের মধ্যে পর্বত অভিযাত্রী সঙ্ঘের সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীঅশোক কুমার সরকার, সম্পাদক শ্রীসুবল বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিযানের সহযাত্রীরা এবং শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রখ্যাত সাংবাদিক, সুসাহিত্যিক ও হিমালয়-প্রেমিক শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ 'ভূমিকা' লিখে দিয়ে আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

পরিশেষে মনে পড়ছে অভিযানের অন্যতম বীর যোদ্ধা শেরপা পাসাং ফুতার, পাসাং শেরিং ও সোনার কথা। তাদের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া আমার পক্ষে মানসী-মানা শিখরে আরোহণ করা সম্ভব হত না। দুর্ভাগ্য আমার, আজ তাদের কেউই আর ইহজগতে নেই। তাদের অমর আত্মার শান্তি কামনা করি।

ভদ্রকালী, হুগলী —লেখক

জুন, ১৯৭২

ভূমিকা

দুটো কারণে আমি এই বই-এর ভূমিকা লিখতে উৎসাহ বোধ করেছি। প্রথম কারণ রাজ রাজেশ্বরী মানা, গাড়োয়াল হিমালয়ের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর আবার অপরূপ সুন্দরী ২৩,৮৬০ ফুট উঁচু পাহাড় মানা; আর দ্বিতীয় কারণ প্রাণেশ। লিকলিকে, লাজুক প্রাণেশ যার আপাত বৈশিষ্টবিহীন বাইরের চেহারার ভিতরে ঢাকা আছে অপরাজেয় প্রাণশক্তির এক অফুরন্ত উৎস। প্রাণেশ, নিঃসন্দেহেই আমাদের একজন শ্রেষ্ঠ পর্বতারোহী। ১৯৬৬ সালে পর্বত অভিযাত্রী সংঘ আয়োজিত মানা-কামেট যুগল শৃঙ্গ অভিযাত্রী দলের সদস্য হিসাবে মানা আরোহণ করেই প্রাণেশ তা প্রমাণ করেছে। বাঙালী পর্বতারোহীদের মধ্যে উচ্চতম শৃঙ্গে ওঠার রেকর্ডটি এখনও পর্যন্ত তারই।

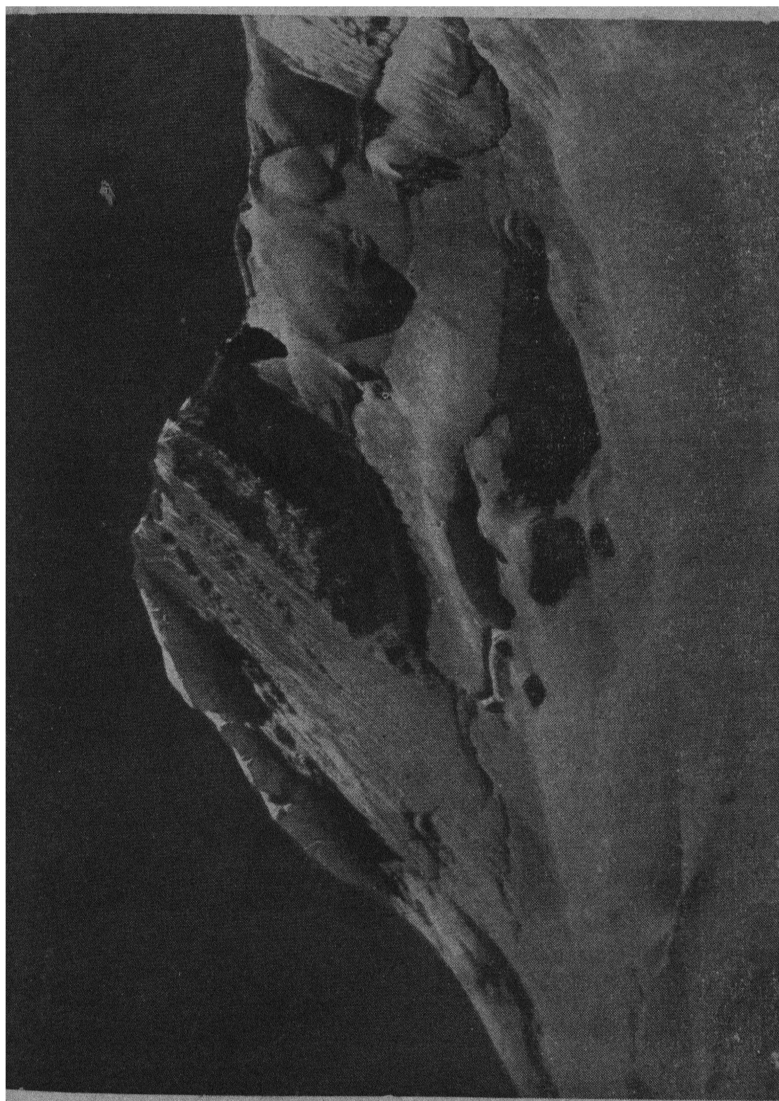
এবার মানার কথা বলি। মানার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে ১৯৬১-তে, এই পর্বত অভিযাত্রী সংঘেরই উদ্যোগে সংগঠিত প্রথম মানা অভিযানে। আমি ছিলাম সাংবাদিক সদস্য। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রেরিত রিপোর্টার। এবং ওইটেই আমার দ্বিতীয় ও শেষ পর্বতযাত্রা। বিমোহিনী মানাকে দেখেই আমি তার প্রেমে পড়ে যাই। শরতের পরিচ্ছন্ন সকালে আজও মানার এই সমুন্নত মহিমা আমার চোখে ভেসে ওঠে।

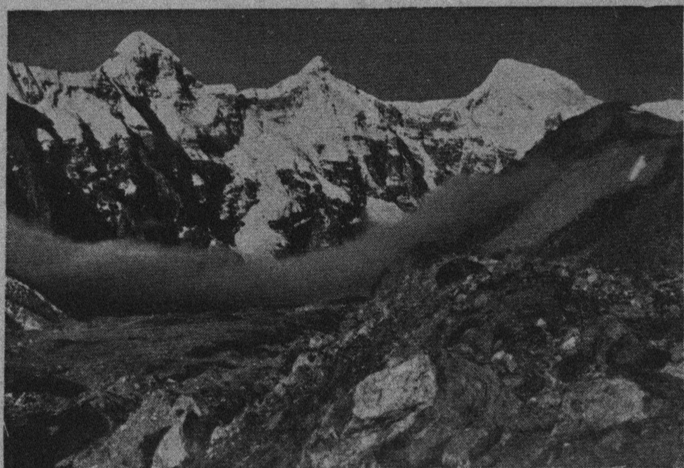
বসুধারাতাল ছাড়িয়ে রাইকানা হিমবাহের পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে গেলেই রাইকানা আর পূর্বী কামেট হিমবাহ সঙ্গম। আর সেই সঙ্গমস্থলের কাছাকাছি ছোট্ট একটা চড়াই-এর শীর্ষে উঠলেই দেখা যায় প্রথমে দেওবন, তারপর নামহীন এক মহাশয়া এবং তারপর মানা—হিমালয়ের এই তিন পুত্রকন্যা পরস্পর হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। যেন একটু আগেই তারা নৃত্যের আনন্দে মেতে উঠেছিল, মানুষের দৃষ্টি লাগা মাত্র লজ্জায় তারা এক্ষুণি পাষাণ হয়ে গেল। মানা আমাকে আজও পাগল করে।

'৬১-র মানা অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। '৬৬-র সাফল্য এসেছিল এক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে। মানা যে কী ভয়ঙ্করও, এতেই তার প্রমাণ মিলবে। '৬০ সালে নন্দাঘুন্টি অভিযানের কাহিনী লিখেছিলাম। আমার প্রথম পর্বত অভিযান। চেয়েছিলাম মানার কাহিনী অন্য কেউ লিখুক, এমন কেউ যে মানার আদর আর লাথি আমার চেয়েও বেশি খেয়েছে। প্রাণেশ সে কাহিনী লিখেছে। আমি খুবই খুশি, এ কাজে ওর চেয়ে যোগ্য আর কে আছে?

জুন, ১৯৭২

—গৌরকিশোর ঘোষ



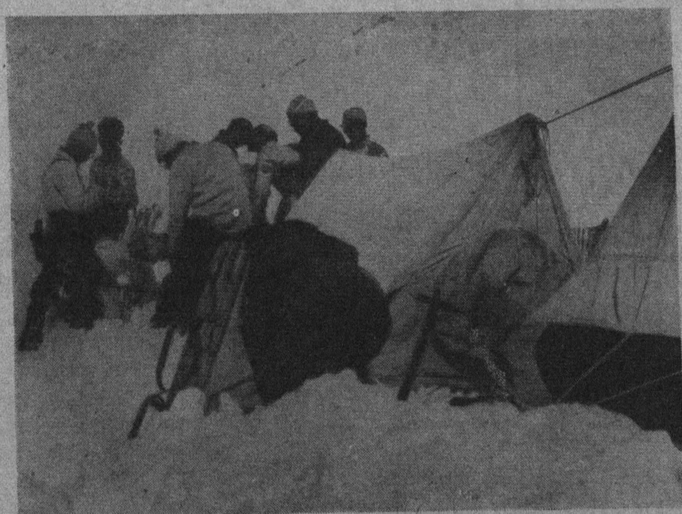


দেওবন (২২,৪৮০ ফুট), অনামী শৃঙ্গ (২২,৮৯২ ফুট) ও মানা (২৩,৮৬০ ফুট)



মূল শিবিরের পথে

তৃতীয় শিবির (১৯,২০০ ফুট)। ডানদিকে কামেট



পঞ্চম শিবির (২২,৮০০ ফুট)

পঞ্চম শিবিরের পথে

হিমালয়ের কথা লিখতে বসেছি। লিখতে বসেছি হিমালয়ের দুর্জয় শৃঙ্গ মানার কথা। কিন্তু কোনখান থেকে আরম্ভ করব, কবে থেকে শুরু করব? মূল শিবির থেকে কি? না আমার জীবনের সেই সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্তটি থেকে?

কিন্তু তার আগেও যে অনেক কথা বলার আছে। আর সেই কথা দিয়েই আমার এ অভিযান শুরু।

২৫শে জুলাই, ১৯৬৬। তারিখটা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। তখনও দশটা বাজে নি। অফিসে পৌঁছে দেখি গোটা অফিস ঘরটাই প্রায় শূন্য। দু'চারজন যাঁরা এসেছেন, তাঁরা বসে বসে ঝিমুচ্ছেন। তাঁদের মাথার ওপর পাখাগুলো কেবল বন্ বন্ করে ঘুরছে। কে বলবে যে আর একটু পরেই দশ তলার এই ঘরটিতে প্রচণ্ড কর্মচাঞ্চল্য দেখা দেবে।

আমি নিঃশব্দে হাজিরা খাতায় সই করে নিজের চেয়ারে আসব বলে ঘুরে দাঁড়িয়েছি, অমনি ক্রিং ক্রিং শব্দে টেলিফোনটা বেজে উঠল।

ভীষণ রাগ হল আমার। ট্রাম-বাস ঠেঙিয়ে এই প্রচণ্ড গরমে আমি রীতিমত শ্রান্ত-ক্লান্ত। কোথায় চেয়ারে বসে এখন দু'দণ্ড বিশ্রাম নেব, তা নয়। এখনই টেলিফোন ধরে কাজের কথা বল। প্রবল বিতৃষ্ণায় আমার মনটা ভরে ওঠে।

তবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘুরে দাঁড়াতে হল আবার। তারপর অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে রিসিভারটা তুলে নিই—হ্যালো···

—হ্যালো, প্রাণেশ চক্রবর্তীকে একটু ডেকে দিন না। অপর প্রান্ত থেকে একটি অপরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

—বলছি। আমি যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত।

—ও, প্রাণেশবাবু বলছেন নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—নমস্কার।

—নমস্কার। কিন্তু···আমায় মাফ করবেন, আমি আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না। আপনি···

—না না সে তো ঠিকই। আপনি আমাকে চিনবেন কেমন করে। হাসতে হাসতে বলেন অপর প্রান্তের লোকটি—আমার নাম বিশ্বদেব বিশ্বাস।

—বিশ্বদেব বিশ্বাস। আমি বিস্মিত।

—হ্যাঁ, আমি বিশ্বদেব বলছি।

—আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার আলাপ না থাকতে পারে কিন্তু আপনাকে আমি খুবই চিনি। আপনি একজন স্বনামধন্য পর্বতারোহী। আপনাকে বাংলাদেশে কে না-চেনে! তা কি ব্যাপার বলুন তো?

—আপনার সঙ্গে আমার দেখা করার ভীষণ দরকার।

—কী দরকার বলুন?

—আপনি জানেন কিনা জানি না, আমাদের পর্বত অভিযাত্রী সঙ্ঘ এবারে মানা ও কামেট শৃঙ্গে একটি অভিযানের আয়োজন করেছেন···

—হ্যাঁ, খবরের কাগজে দেখেছি···

—এই অভিযানের বিষয় নিয়েই আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

—তা বেশ তো, বলুন না···

—দেখুন, ফোনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা সম্ভব নয়। তা ছাড়া আমি এখন খুবই ব্যস্ত। কাজেই আপনি যদি দয়া করে আজ বিকেলে একবার আমাদের সঙ্ঘের অফিসে আসেন তো খুব ভাল হয়।

—কিন্তু…

—কোন কিন্তু টিন্তু নয় প্রাণেশবাবু। আপনাকে আমার ভীষণ দরকার। প্লিজ, বিকেলে একটু সময় করে আসুন। তখন আমি আপনাকে সব বলব।

—ঠিক আছে, যাব।

টেলিফোন রেখে নিজের চেয়ারে এসে বসি। একেই বলে ঘটনা। কোনদিন এত তাড়াতাড়ি অফিসে আসি না। আজকেই এসেছি—হয়তো এই ফোনটির জন্য!

চেয়ারে বসে বসে অনেকক্ষণ ভাবলাম। কী এমন দরকার আমার সঙ্গে বিশ্বদেববাবুর? মানা-কামেট অভিযান সম্পর্কে কী আলোচনা করতে চান তিনি? কিন্তু কোন কূলকিনারা করতে পারলাম না। সারাটা দিন কেবল নানা এলোমেলো চিন্তা ও উত্তেজনার মধ্যেই কাটল।

নির্দিষ্ট সময়ের একটু আগেই আনন্দবাজার পত্রিকাভবনে হাজির হলাম।

তিন তলায় পা রাখতেই একজন সুবেশ তরুণ স্মিত হেসে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। তারপর হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে তিনি বললেন, আমার নাম শিশির ঘোষ। আপনার জন্যই আমি অপেক্ষা করছিলাম। এখানে আসতে আপনার কোন অসুবিধা হয় নি তো?

—না, কোন অসুবিধা হয় নি, আমি হাসতে হাসতে বলি। বিশ্বদেববাবু কোথায়?

—আপনি আমার সঙ্গে আসুন। ওরা সকলেই আপনার জন্য উদগ্রীব হয়ে বসে রয়েছে।

—তাই নাকি?

—সেটাই তো স্বাভাবিক প্রাণেশবাবু।

আমরা সিঁড়ি দিয়ে সোজা ছাতে উঠে আসি।

ওরা অনেকেই ক্যান্টিনে বসেছিলেন। বিশ্বদেববাবু উঠে এসে

আমাকে অভ্যর্থনা জানান। কুশল আদান-প্রদানের পরে তিনি উপস্থিত সকলের সঙ্গে একে একে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। ইনি নিমাই বসু, মানা-কামেট অভিযানের সহ-নেতা। ইনি প্রদ্যোৎ চ্যাটার্জী, অভিযানের সদস্য। আর ইনি ধ্রুব মজুমদার, আমাদের প্রধান পরামর্শদাতা। আর ইনি হচ্ছেন—বলেই বিশ্বদেববাবু পিছন ফিরে যার কাছে নিয়ে গেলেন, সে আমার বিশিষ্ট বন্ধু—নিতাই রায়কে তো আপনি খুব ভালভাবেই জানেন। তার সঙ্গে আপনার আর কি পরিচয় করিয়ে দেব। আপনার মত নিতাইবাবুকেও ডেকে এনেছি। নিতাইবাবুর কাছ থেকেই আমি আপনার টেলিফোন নাম্বার সংগ্রহ করেছি।

বলা বাহুল্য, নিতাই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমরা উভয়ে উনিশ শো বাষট্টি সালে গাড়োয়াল হিমালয়ের সফলকাম নীলগিরি পর্বত অভিযানের সদস্য ছিলাম। নিতাই সে বছর সহ-নেতা ভানু ব্যানার্জি এবং পাঁচজন শেরপা সহ নীলগিরি (২১,২৬৪ ফুট) শিখরে আরোহণ করেছিল। সেই অভিযানের কথা ও কাহিনী নিয়ে শঙ্কু মহারাজ 'নীল-দুর্গম' গ্রন্থখানি রচনা করেছেন।

. আমরা সকলেই গোল হয়ে চেয়ারে বসলাম। ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা নিয়ে শুরু হল মানা-কামেট অভিযান প্রসঙ্গ। নেতা বিশ্বদেব বিশ্বাস জানালেন পাহাড়ে রওনা হতে আর বেশিদিন বাকি নেই। অথচ বিস্তর কাজ এখনও বাকি।

কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়েছে দল গঠন নিয়ে—বিশ্বদেব বিশ্বাস বলতে লাগলেন—মানা ও কামেটের মত দু'টি দুর্ধর্ষ শৃঙ্গ আরোহণের জন্য সর্বাগ্রে চাই একটি শক্তিশালী দল। আমরা এখনও সেই দলটি গঠন করে উঠতে পারি নি। ভাল 'ক্লাইম্বার' চেয়ে কাগজে দিনের পর দিন বিজ্ঞাপনও দিয়েছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, গোটা বাংলাদেশ থেকে একটি নামও পাওয়া যায় নি।

—তাই অনন্যোপায় হয়ে আমরা অবশেষে আপনার এবং

নিতাইবাবুর শরণাপন্ন হয়েছি। আমাদের একান্ত ইচ্ছা আপনাদের উভয়কে আমাদের এই অভিযানে পাই।

প্রস্তাব শুনে আমি রীতিমত আনন্দ বোধ করি। কেন না, মানা ও কামেট শৃঙ্গ অভিযানে যাওয়ার লোভ সংবরণ করা যে-কোন পর্বতারোহীর পক্ষেই অত্যন্ত কঠিন। বিশেষ করে আমার মত একজন সাধারণ পর্বতারোহীর কাছে এই আমন্ত্রণ রীতিমত লোভনীয়, চিত্তাকর্ষক্।

তবু কেন জানি এই মুহূর্তে মনে হল, এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এখনই মতামত দেওয়া ঠিক হবে না। তা ছাড়া আমার মানসিক প্রস্তুতিও তেমন কিছু ছিল না। সে সমস্ত কথা বিবেচনা করে আমি বিশ্বদেববাবুকে বলি—আমাকে কয়েকটা দিন ভেবে দেখবার অবকাশ দিন। কারণ এটা পর্বতাভিযান না হয়ে অন্য কিছু হলে হয়তো আমার পক্ষে সম্মতি দিতে কোন অসুবিধা হোত না। যেহেতু এটা পর্বতাভিযান আর মানা-কামেটের মত দু'টি দুর্ধর্ষ পর্বত-শৃঙ্গ, সেইহেতু আমাকে একটু চিন্তা করতে হবে।

শুনে বিশ্বদেববাবু মৃদু হাসেন। তিনি বলেন—ঠিক আছে, আপনি ভেবে দেখুন। তবে কয়েকটা দিন এজন্য চাইবেন না। যত শীঘ্র সম্ভব, আই মিন, আগামীকাল এই সময়ের মধ্যে যদি আপনি আপনার সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দেন, তা হলে খুব ভাল হয়। কারণ এর বেশি দেরি করা আমাদের পক্ষে খুব কষ্টসাধ্য হবে।

—ঠিক আছে, আমি তাই চেষ্টা করব।

—চেষ্টা করব বলবেন না, বলুন আগামীকাল আপনি আমাদের জানিয়ে দিয়ে যাবেন।

—এবং আমাদের স্থির বিশ্বাস, আপনি যে সিদ্ধান্তটা নেবেন তা আমাদের অনুকূলেই নেবেন, কি বলেন প্রাণেশবাবু? হাসতে হাসতে নিমাই বোস বলেন।

এর পর নিতাই-এর প্রসঙ্গ ওঠে। নিতাই বলে, এ যাত্রায়

অবশেষে এল সেই শুভদিন। যাত্রা করার পুণ্যলগ্ন—১৯শে আগস্ট, ১৯৬৬।

হাওড়া স্টেশনের ছ'নম্বর প্ল্যাটফর্ম লোকে লোকারণ্য। যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও তিল ধারণের স্থান নেই। চারিদিকে কেবল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ভিড়। তাদের অনেকেরই হাতে ফুলের মালা, ফুলের তোড়া। কেউ কেউ সঙ্গে এনেছেন ফল, মিষ্টি, নয়তো ঠাকুরের প্রসাদী ফুল-সিঁদুর ইত্যাদি। সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে বিদায়লগ্নে অভিযাত্রীদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাতে, বুকভরা স্নেহ ও ভালবাসা উজাড় করে দিতে।

প্রবল গুঞ্জন চারিদিকে। মাঝে মাঝেই সোল্লাস চিৎকার আর জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠছে। উচ্ছ্বসিত এই জনতাকে সামলাতে কর্ডন সৃষ্টিকারী মানুষগুলো রীতিমত হিমসিম খাচ্ছে। এই বুঝি কর্ডন ভেঙে তারা ভেতরে অভিযাত্রীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

রাত তখন আটটা। দুন এক্সপ্রেস ছাড়তে আর মাত্র আধ ঘণ্টা বাকি। এমন সময় ত্রস্ত পায়ে মানুষের ভিড় ঠেলে কর্ডনের ভেতরে ঢুকলেন দেশ ও আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীঅশোককুমার সরকার তাঁর হাতে তুষার গাঁইতিতে বাঁধা ভারতের জাতীয় পতাকা। অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে তিনি সেই পতাকা তুলে দিলেন মানা-কামেট অভিযানের নেতা বিশ্বদেব বিশ্বাসের হাতে। সঙ্গে সঙ্গে নতজানু হয়ে প্রণাম করলেন বিশ্বদেবদা। মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন পর্বত অভিযাত্রী সঙ্ঘের সভাপতি। শ্রী সরকার, আমাদের নেতাকে সস্নেহে বুকে টেনে নিলেন। সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীসুবল বন্দ্যোপাধ্যায়ও দলনেতাকে মালা পরিয়ে আশীর্বাদ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে জয়োল্লাস। জয়ধ্বনিতে ফেটে পড়ল চারিদিক। মেয়েরা উলু দিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে, এই শুভ মুহূর্তটিকে পরম রমণীয় করে তুললেন।

কয়েকটি মুহূর্ত বুঝিবা কেটেছে। সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের ইতি হয়েছে। অভিযাত্রীদের প্রত্যেকের গলায় ফুলের মালা, ললাটে সিঁদুর। সাধারণ মানুষের এই অভিব্যক্তিতে তারা সকলেই অভিভূত। হাত আন্দোলিত করে অভিযাত্রীরা সকলকে কৃতজ্ঞতা জানায়। আর ঠিক সেই সময়ে অগণিত মানুষের দল কর্ডন ভেদ করে ভেতরে ঢুকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় ঠেলাঠেলি, ধ্বস্তাধ্বস্তি। ফুলের মালা আর ফুলের তোড়ায় অভিযাত্রীদের চোখ-মুখ ঢেকে যায়। দু'হাত ভরে ওঠে ফল আর মিষ্টিতে। আনন্দে উদ্বাহু হয়ে জনতা তাদের আলিঙ্গন করে, কোলে টেনে নেয়। এরই মধ্যে আবার অতি উৎসাহীর দল কোন কোন অভিযাত্রীকে কাঁধে বসিয়ে নাচতে শুরু করে। সে এক প্রাণান্তকর অবস্থা। তবু বলতে দ্বিধা নেই, স্বতঃস্ফূর্ত মানুষের এই চিরন্তনী অভিব্যক্তির তুলনা বিরল।

এদিকে ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে এল। হাতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় বাকি। অভিযাত্রীরা পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তারা যে ভিড় ঠেলে নির্দিষ্ট কামরায় উঠতে পারবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এখনও অতি উৎসাহীর দল তাদের গলায় ফুলের মালা দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

অবশেষে জনতাকে শান্ত হতে অনুরোধ করা হল। আবেদন করা হল অভিযাত্রীদের ছেড়ে দেবার জন্য। আর তাতে কাজও হল। মুহূর্তের মধ্যে হর্ষোৎফুল্ল মানুষের দল সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে দু'পাশে সরে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। পথ করে দিল অভি-যাত্রীদের গাড়িতে ওঠার জন্য।

অদূরে এককোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম এই দৃশ্য। অভি-যাত্রীদের কামরার দিকে এগুতে দেখে আমিও তাদের পিছু ধরি। গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যাই সামনের দিকে।

কিন্তু অকস্মাৎ বাধা পেলাম। কে যেন সজোড়ে আমার কব্জি

চেপে ধরেছে। কিছুতেই আমি আমার হাত ছাড়াতে পারলুম না। সুতরাং বাধ্য হয়েই দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

একটু পরেই ব্যাপারটা আমার বোধগম্য হল। যে বলিষ্ঠ যুবকটি আমার হাত ধরে রেখেছে তার দিকে তাকাতেই খেয়াল হল, একটু আগে সে হাত ধরাধরি করে কর্ডন নিয়ন্ত্রণ করছিল।

আমি অস্ফুটস্বরে তাকে বলি—হাতটা ছেড়ে দিন। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে আমার দিকে কটমট করে তাকাল। তারপর একরকম টানতে টানতেই সে আমাকে বের করে নিয়ে যেতে লাগল।

আমি মৃদু প্রতিবাদ করি। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না। বরং সে আরো রাগে ফেটে পড়ে। মুখ খেঁকিয়ে বলে ওঠে—তখন থেকে আপনাকে লক্ষ্য করছি মশাই, আপনি ঐ অভিযাত্রীদের পিছু নিয়েছেন। বলি, আপনার উদ্দেশ্যটা কি বলতে পারেন?

—ওখানে, মানে ওদের কাছে আমার যাওয়া একান্ত দরকার, আমি সবিনয়ে বলি। তাকে বোঝাতে চাই যে, আমিও অভিযাত্রীদের একজন। কিন্তু পারি না।

—ওখানে কি এমন মধু আছে যে, আপনার একান্ত যাওয়া দরকার। লোকটি মুখ ভেংচে ওঠে। তারপর আহত স্বরে সে বলতে থাকে—আপনার মত কিছু লোক আজ এই অনুষ্ঠানটাকে মাটি করে দিয়েছেন তা জানেন? অযথা হুড়োহুড়ি করে এই কাণ্ডটা না করলেই কি চলত না! ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে, ছেলেগুলোকে কোথায় এখন গাড়িতে উঠতে সাহায্য করবেন আপনারা, তা নয়, শুধু শুধু হয়রানি করছেন।

—কিন্তু আমাকে যে ওখানে···

—কাল যাবেন। লোকটি চিৎকার করে ওঠে, আর তা যদি একান্তই সম্ভব না হয় তা হলে এখানে অপেক্ষা করুন। ট্রেন ছেড়ে যাক, পরে যাবেন। আপনি যাকে খুঁজছেন সে নিশ্চয় পালিয়ে যাবে না, অপেক্ষা করবে। এই বলে সে আমাকে ভীড়ের পেছনে

ফেলে রেখে অদৃশ্য হয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও আমি পরে আর তার টিকি খুঁজে পেলুম না।

হঠাৎ সামনের দিকে নজর পড়তেই আমি চমকে উঠলুম। গাড়ি ছাড়ার সবুজ সঙ্কেত দিয়ে দিয়েছে। তাই দেখে আমার হাত পা শিথিল হয়ে এল। ওরা আমাকে কামরার মধ্যে দেখতে না পেলে মহা দুশ্চিন্তায় পড়বে। অথচ তাড়াতাড়ি এখান থেকে ছুটে যাব তারও কোন উপায় দেখছি না।

অগত্যা একরকম বাধ্য হয়েই পাশের কামরার দিকে তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম। সেখানে মানুষের ভিড় নেই বললেই চলে। কামরার দরজা একেবারে ফাঁকা। স্থির করে ফেলি, আপাততঃ এখানেই উঠে পড়ব। পরে যা হবার হবে।

দরজা দিয়ে ঢুকতে যাব, দেখি ধ্রুবদা দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখেই তিনি একগাল হেসে ফেলেন—তুইও এ্যাইহানে ?

—কার বাবার সাধ্যি আছে ওখানে যায়।

—যা কইছস। হালায় প্রচণ্ড ভীড় হইছে।

—কিন্তু একটা কথা ধ্রুবদা, বিশ্বদেবদারা আমাদের দেখতে না পেলে নিশ্চয়ই খুব চিন্তায় পড়বেন···

—তা আর কি করা যাইব। চলত এ্যাহন এই কামরায় উইঠ্যা পড়ি। পরে যা হয় দেখা যাইব।

ট্রেনের হুইসেল শোনা গেল। আমরা বৃথা বাক্যব্যয় না করে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ি। এমন সময় দেখি শিবশঙ্করদা ছুটতে ছুটতে আমাদের দিকে আসছেন।

কি হয়েছে জিজ্ঞেস করবার আগেই তিনি তাঁর দৈত্যের মত দু'খানা হাত বাড়িয়ে দিলেন আমাদের দিকে। তারপর একরকম টানতে টানতেই তিনি আমাদের নির্দিষ্ট কামরায় ঠেলে তুলে দেন। তখন ট্রেন চলতে শুরু করেছে।

প্ল্যাটফর্মে দণ্ডায়মান শুভার্থীরা তখনও হাত নেড়ে কিম্বা

রুমাল উড়িয়ে বিদায় অভিনন্দন্ জানাচ্ছেন। অনেকের মুখেই ম্লান হাসি। আবার কারো বা চোখ দু'টি অশ্রুসজল। আমার চোখ দু'টিও ঝাপসা হয়ে এল।

॥ দুই ॥

অজানাকে জানবার আগ্রহ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে মানুষ চিরদিন আপন সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে অজানার উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছে। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-পরিজন, সংসারের মায়া-মমতা, নানা প্রলোভন ইত্যাদিও তাকে সে কাজ থেকে বিরত করতে পারে নি। বরং পথের শত-সহস্র বাধা-বিপত্তিকে সে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে গেছে তার স্থির লক্ষ্যে। তার জন্য মানুষ সব সময়েই যে সাফল্য লাভ করেছে তা নয়, তাই বলে সে নিরস্ত হয় নি, বিচ্যুত হয় নি স্বীয় কাজ থেকে। কারণ, এ নেশাকে কোন কিছুর দ্বারাই বশীভূত করা সম্ভব নয়। অনাদিকাল থেকে মানুষ এ নেশায় মেতেছে এবং অনন্তকাল অবধি এই মাতন চলবে বিরামহীনভাবে।

এমনি এক নেশা পর্বতাভিযান। জনপদ থেকে দূরে, প্রকৃতির প্রতিকূল পরিবেশে কি যেন এক অজানা রহস্য লুকিয়ে আছে! দূরের ওই শ্বেতশুভ্র মৌন শৃঙ্গগুলি অবিরত হাতছানি দিচ্ছে কাছে যাবার জন্য। কি এক অদ্ভুত মায়াজাল ছড়ানো রয়েছে সেখানে, যেন মন্ত্রশক্তির বিপুল টানে সর্বদাই টানছে। একে উপেক্ষা করার সাধ্য মানুষের নেই। তাই সে বন্ধুর পথের পথশ্রম, প্রবল ঠাণ্ডা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ইত্যাদি নির্দ্বিধায় উপেক্ষা করে এগিয়ে যায়। মৃত্যু-ভয়ও তাকে টলাতে পারে না। পাহাড়ের ডাক তাই বড় মধুর। আবার মর্মান্তিকও। দেহের রক্তকে বড় চঞ্চল করে তোলে।

হিমালয়ের দেশ ভারতবর্ষে কিন্তু পর্বতারোহণ এবং পর্বতা-ভিযানের সত্যিকারের আগ্রহ দেখা যায় ১৯৫৩ সালে ব্রিটিশ অভিযাত্রী দলের সঙ্গে শ্রীতেনজিং নোরগের এভারেস্ট শৃঙ্গ আরোহণের পরে। তার আগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে বহু পর্বত অভিযাত্রীদল সাতসমুদ্র তের নদী পার হয়ে আসতেন ভারতবর্ষে। তাঁরা হিমালয়ের বিভিন্ন শৃঙ্গে অভিযান চালাতেন। আর আমরা ভারতবাসীরা তা-ই সাগ্রহে লক্ষ্য করতাম। ভাবতাম, এ বুঝি ওদের পক্ষেই কেবল সম্ভব। কিন্তু কোনদিনই কেউ ভাবে নি যে, আমাদের হিমালয়ে আমাদেরই মাটির মানুষ সুযোগ ও সুবিধা পেলে এগিয়ে যেতে পারে।

১৯৫৩ সালে শ্রীতেনজিং নোরগের এভারেস্ট আরোহণের পরে আমরা সে কথা প্রথম উপলব্ধি করি। তৎকালীন পশ্চিম-বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আগ্রহাতিশয্যে এদেশে সর্বপ্রথম পর্বতারোহণ শিক্ষার স্থায়ী ব্যবস্থা হয়। এ সম্পর্কে আমাদের জাতীয় সরকারের তরফ থেকে সুইস-ফাউণ্ডেশন ফর এ্যালপাইন রিসার্চের কাছে একটি স্কীম চেয়ে পাঠানো হয় এবং সরকার তা অনুমোদন করেন। অবশেষে সুইস মাউণ্টেনিয়ারিং স্কুলের অধ্যক্ষ মিঃ আর্নোল্ড গ্ল্যাটহার্ডের আন্তরিক প্রচেষ্টায় দার্জিলিং-এর বার্চ হিলে (বর্তমানে জওহর পর্বত নামে পরিচিত) হিমালয়ান মাউণ্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। আর পাহাড়ে ওঠার কলা-কৌশল শিক্ষা দেবার জন্য সিকিমের জোংরি (বর্তমানে চৌরিকিয়াং-এ) আদর্শ স্থান হিসেবে পরিগণিত হয়। কারণ এর সন্নিকটেই অনেকগুলি হিমবাহ রয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা এখানে অতি সহজেই আইস-ক্র্যাফ্ট শিখতে পারে। সে যাই হোক, এই পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রের ডাইরেক্টার অব্ ফিল্ড ট্রেনিং পদে এভারেস্ট বিজয়ী বীর শ্রীতেনজিং নোরগেকে নিযুক্ত করা হয়।

সেই প্রথম ১৯৫৪ সালে পর্বতারোহণ শিক্ষার স্কুল খোলা হয়

ভারতবর্ষে। অত্যন্ত আনন্দের কথা, আমাদের এই মানা-কামেট অভিযানের সকলেই এই স্কুলের ছাত্র।

পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একেবারে নবাগত বলা চলে। হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট স্থাপিত হবার পরে রাজ্যের বহু তরুণ-তরুণী শিক্ষা নিতে শুরু করে। কিন্তু সেই শিক্ষালব্ধ জ্ঞানকে দলগতভাবে পর্বতাভিযানে কার্যকরী করার প্রয়াস দেখা যায় নি। অবশ্য নানা কারণেই যে তা সম্ভব হয়ে ওঠে নি তা বলাই বাহুল্য। পর্বতাভিযান রীতিমত ব্যয়সাপেক্ষ। বিশেষ ‘বিশেষ ধরনের খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি বহুবিধ জিনিসের প্রয়োজন হয় একাজে। আর তা একক প্রয়াসে সংগ্রহ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এর জন্য চাই সরকারী স্তরের সাহায্য। সর্বোপরি সাধারণ মানুষের সহযোগিতা।

কিন্তু এই সমস্ত বাধা-বিঘ্ন বেশি দিন বাংলাদেশের তরুণদের দাবিয়ে রাখতে পারে নি। ১৯৬০ সালে কয়েকজন হিমালয় প্রেমিকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের প্রথম বেসরকারী সংস্থা ‘হিমালয়ান এসোসিয়েশন’ প্রতিষ্ঠা হয়। এই সংস্থার সভাপতি ও সহসভাপতি হন শ্রদ্ধেয় শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল। প্রখ্যাত পর্বতারোহী সুকুমার রায় সম্পাদক নিযুক্ত হন। অমিতাভ দাশগুপ্ত, কমল গুহ, রণেশ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন সরকার, ধ্রুব মজুমদার, বিশ্বদেব বিশ্বাস, শৈলেশ চক্রবর্তী, দেবীদাস দত্ত প্রভৃতি হলেন এই এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভ্য। তাঁরাই এই বছরে নন্দাঘুন্টি অভিযানের আয়োজন করেন। ঐ দামাল ছেলের দল সুকুমার রায়ের নেতৃত্বে নন্দাঘুন্টি শিখর আরোহণ করে বাংলাদেশে এক নবযুগের সৃষ্টি করেছিল।

বস্তুতপক্ষে সেদিন ঐ নন্দাঘুন্টি অভিযানে সাফল্যলাভ করতে না পারলে আজকে বাংলাদেশে পর্বতারোহণ ও পর্বতাভিযানের কি হাল হত বলা মুশকিল। হয়তো বা চিরদিনের মতই এ রাজ্য থেকে

এ জাতীয় প্রয়াস অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেত। এ প্রসঙ্গে দেশ ও আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীঅশোক কুমার সরকারের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি যদি সেদিন তাঁর সাহায্যের প্রশস্ত হাত নিয়ে এগিয়ে না আসতেন, তা হলে কিছুতেই আজ বাংলাদেশে পর্বতারোহণ এবং পর্বতাভিযান প্রসার লাভ করত না। নন্দাঘুন্টি অভিযানকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে তিনি পরোক্ষভাবে এ রাজ্যের তরুণ-তরুণীদের দুঃসাহসিক এ্যাডভেঞ্চারের পথে পা বাড়াতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন।

বলা যেতে পারে, সেই থেকে যাত্রা হল শুরু। এর পরে বাংলাদেশের বহু তরুণ এই দুঃসাহসিক কাজে এগিয়ে আসবার অনুপ্রেরণা লাভ করে। গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকটি ছোট-বড় পর্বতাভিযান সংগঠিত হয়েছে। তাদের সবগুলিই যে জয়ের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছে তা নয়। তবে একথাও ঠিক, অন্যান্য খেলাধূলার চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের বলেই পর্বতাভিযানে পরাজয় বলে কিছু নেই বলেই আমার ধারণা।

জানালার ধারে বসে বসে ভাবছিলাম। অকস্মাৎ দিলীপদার ডাকে সম্বিৎ ফিরে পাই—কি অত ভাবছ প্রাণেশ ?

সামনে তাকাতেই দেখি দিলীপদা কয়েকটি ছোট-বড় ক্যামেরা, লেন্স, ফিল্ম, বালব ইত্যাদি ফটোগ্রাফির নানা সরঞ্জাম সামনে ছড়িয়ে বসে আছেন।

পর্বতারোহী হিসেবে দিলীপ ব্যানার্জি—আমাদের দিলীপদা একজন দক্ষ পর্বতারোহী। দার্জিলিংয়ের হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে পর্বতারোহণের শিক্ষা নিয়েছেন। ১৯৬০ সালে নন্দাঘুন্টি শিখরে (২০,৭০০ ফুট) তিনি দলনেতা সুকুমার রায়ের সঙ্গে আরোহণ করেন। তারপরে ১৯৬১ সালে মানা ও ১৯৬৪ সালে সফলকাম কাক্রডোম অভিযানেরও সদস্য ছিলেন তিনি।

ফটোগ্রাফিতে অসাধারণ ভাল হাত দিলীপদার। সেজন্যই বোধ

করি তাঁকে বাদ দিয়ে দল গঠন অচিন্ত্যনীয়। ইতিপূর্বে সব ক'টি অভিযানেই তাঁর উপর ফটোগ্রাফির গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। পর্বত-পৃষ্ঠের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে শিল্পীসুলভ দক্ষতার সঙ্গে পর্বতারোহণের ইতিবৃত্তকে সেলুলয়েডে আবদ্ধ করতে দিলীপদার জুড়ি নেই বললেই চলে।

সুদীর্ঘ ও সুপটু দেহের অধিকারী এই মানুষটির মুখে সর্বদাই যেন হাসি লেগে আছে। যে কোন বিষয়ে তার কৌতুক এবং সরস মন্তব্য মানুষকে আকৃষ্ট করতে বাধ্য করে।

এবারেও দিলীপদা অভিযানের স্থিরচিত্র ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র গ্রহণের দায়িত্ব নিয়েছেন।

বিপুল গতিতে ট্রেন ছুটে চলেছে। গোটা কামরা ফুলের গন্ধে ম ম করছে। এখানে ওখানে সকলেই বসে আছে গা এলিয়ে দিয়ে। চোখে-মুখে প্রত্যেকেরই কেমন যেন একটা ক্লান্তির চিহ্ন।

আমি উঠে ধীরে ধীরে দিলীপদার কাছে এসে দাঁড়াই। দিলীপদা হেসে বলেন—কি ভাবছিলে বসে বসে?

—কই, না তো!

—নিশ্চয়ই কিছু ভাবছিলে! সে যাই হোক্, আমাকে একটু হেলপ্ করো তো। এগুলো একটু গুছিয়ে নিই।

আমি কোন বাক্য ব্যয় না করে কাজে লেগে যাই।

মদনদা বাঙ্কের উপর বসে বসে যেন কি করছিলেন। হঠাৎ তিনি ঝুপ্ করে লাফিয়ে নিচে নেমে পড়লেন। তারপর বেঞ্চের নিচে থেকে প্রকাণ্ড একটা মাটির হাঁড়ি বার করে বলেন—রাত অনেক হয়েছে বন্ধুগণ। এসো, আমরা ডান হাতের পর্বটা শেষ করে ফেলি। বলেই তিনি একগাদা শালপাতা আর মাটির ছোট ছোট গ্লাস বের করলেন।

—হাঁড়িটাতে কি আছে রে মদন? ধ্রুবদা জানতে চান।

—জানি না কি আছে, তবে গন্ধ শুঁকে মনে হচ্ছে মাংস।

—খাসা জিনিস। তাড়াতাড়ি লাগা দিকি—দিলীপদা পাশ থেকে বলে ওঠেন।

—দিচ্ছি ভাই। তোরা সব এদিকে এসে বোস, তা হলে দিতে সুবিধে হবে। মদনদা ওপরের কাগজের মোড়ক খুলতে খুলতে বলেন, বিশ্বদেব খাবি না? এদিকে আয়।

জানালার ধারে বিশ্বদেবদা চুপচাপ বসেছিলেন। ওঁর গায়ের সবুজ গেঞ্জিটা এখনও ভিজে সপসপে। বেচারী সবচেয়ে বেশি ক্লান্ত। কারণ, মানুষের বেশির ভাগ উচ্ছ্বাসই গেছে ওর ওপর দিয়ে। দলনেতা বলে ও কারুরই সোহাগ থেকে বঞ্চিত হতে পারে নি। আর সেই কারণেই সমস্ত ধকলটা ওঁকে সহ্য করতে হয়েছে। মদনদার ডাক শুনে বিশ্বদেবদা প্রায় একরকম টলতে টলতে উঠে আসেন—আগে সুজন, নারায়ণ ওদের দে। আমি পরে খাচ্ছি। বিশ্বদেবদা বলেন।

—ওয়াটার বটলগুলিতে জল নেওয়া হয়েছিল তো? মদনদা মাটির গ্লাসে মাংস তুলতে তুলতে জিজ্ঞাসা করেন।

—হ্যাঁ, সুজন উত্তর দেয়।

—তা হলে পাউরুটিগুলো বার করে তোরা সবাই নিয়ে নে, আমি মাংস দিয়ে দিচ্ছি। শুরু কর তোরা।

কামরার অন্যান্য যাত্রীরা গাড়ি ছাড়ার আগে থেকেই সবকিছু লক্ষ্য করছিল। উত্তাল মানুষের ভীড়, পুষ্পবৃষ্টি, উলুধ্বনি, শাঁখের আওয়াজ ইত্যাদি কোন কিছুই তাদের নজর এড়ায় নি। সব কিছুই তাদের চোখের সামনে ঘটেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন্ কোন্ মানুষগুলোকে নিয়ে এত হৈ চৈ, তা নিশ্চয় তারা ভীড়ের মাঝে বুঝতে পারে নি। সেজন্য হাওড়া স্টেশন থেকে গাড়ি ছাড়ার পর থেকেই থ্রি-টায়ার কম্পার্টমেণ্টের ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাই উঁকি দিয়ে দেখে যাচ্ছিল আমাদের। খেতে খেতে আরো অনেককে দেখতে পেলাম। চোখাচোখি হতে অনেকেই ভাল করে দেখবার আগেই আবার চলে গেল আড়ালে। বেসিন থেকে হাত-মুখ ধুয়ে

ফিরছি, একজন মোটাসোটা মাড়োয়ারী ভদ্রলোক পথ আড়াল করে দাঁড়ালেন—আপ্ লোগ মানা-কামেট মে চলিয়েছেন?

—হ্যাঁ।

—যদি মেহেরবানী করে এইখেনে একটু বোসেন, দু' একটা কোথা জিজ্ঞেস করিয়ে লিবো।

—বেশ তো, বলুন না। বেঞ্চির উপর সযত্নে রচিত তার বিছানার ওপর বসতে বসতে বলি।

—আকবর মে আজ হাম লোগ দেখেছে কী আপলোগ মানা-কামেট মে যাইতে আছেন। তা হামি একঠো কথা বুঝতে পারে নাই, কী মানা ক্যাম্প কিধার হ্যায়? উধার যানে মে ক্যায়া হ্যায়?

আরো দু'তিনজন মাড়োয়ারী আমাকে ঘিরে মুখোমুখি বসেছিলেন। তাঁদের চোখে-মুখেও প্রবল অনুসন্ধিৎসা। তাই আমাদের কথোপকথন পরম উৎকণ্ঠার সঙ্গে তাঁরাও শুনছিলেন। প্রথম ভদ্রলোকের কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে এদের মধ্যে একজন তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করে বসেন—ইসমে যানে সে ক্যায়া নাফা হোতা হ্যায়?

প্রশ্নগুলি শুনে আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করি। তবু ধীরে ধীরে আমি এক এক করে জবাব দিই, এই মানা-কামেটের সঙ্গে মানা ক্যাম্পের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা হিমালয়ের দু'টি শৃঙ্গ মানা ও কামেট শিখরে আরোহণ করতে যাচ্ছি।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে বলি, লাভ অর্থাৎ অর্থকরী লাভ এতে কিছু নেই। এটা হচ্ছে নিছক এ্যাডভেঞ্চার।

—তা নাফা যোখন কিছু নাই, তোখন এতো কষ্ট করিয়ে ওখানে যাইতে আছেন কেন? হঠাৎ প্রথম ব্যক্তিটি আবার প্রশ্ন ছোঁড়েন পাশ থেকে।

এর কি উত্তর দেব বুঝতে পারলাম না। একবার ইচ্ছে হল ম্যালোরির সেই বিখ্যাত উক্তিটি উদ্ধৃত করি। এভারেস্ট আরোহণে আসবার আগে জনৈকা মহিলা সাংবাদিক অনুরূপ প্রশ্নই করেছিলেন

ম্যালোরিকে। একটুও ইতস্ততঃ না করে ম্যালোরি সেদিন বলেছিলেন—'বিকজ হট ইজ দেয়ার'।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল এত জ্ঞানগর্ভ কথা বলার কোন দরকার নেই। তার চেয়ে সহজ সরল কথাতেই যদি জিনিসটা ওদের পরিষ্কার করে দেওয়া যায় তাতে বরং ওরা খুশি হতে পারে। সে কথা ভেবেই আমি বলি—শঙ্করজীকে যদি একটু কষ্ট করলে পাওয়া যায়, তা হলে তাতে দোষ কোথায়?

—না, না, সে তো ঠিক বাতই আছে, সে তো ঠিক বাতই আছে। শঙ্করজীকে পাবার জোন্যে সব কোষ্ট হামিও ভী করতে রাজি আছে। মাথা দুলিয়ে বিগলিত ভঙ্গিতে সমর্থন করে উপস্থিত সকলেই।

—প্রাণেশ, কোথায় গেল প্রাণেশ? অকস্মাৎ মদনদার গলার তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনতে পাই।

পরে কাল আবার আলোচনা করা যাবে, বলে, আমি ওদের কাছ থেকে উঠে আসি। মদনদা আমাকে দেখতে পেয়ে কাগজের বাক্স খুলে হাতে সন্দেশ তুলে দিয়ে বলেন—ভীড়ের মাঝে এই সন্দেশগুলো কে দিয়েছেন জানি না। তবে যিনিই দিয়ে থাকুন, তাঁর প্রতি আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কী বল তোমরা।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। সকলেই হাসতে হাসতে একযোগে চিৎকার করে ওঠে।

গুঞ্জন থেমে যায়। সকলেই সন্দেশ গালে পুরে বুঝি রসনার তৃপ্তি-সুখ উপভোগ করে। দিলীপদা হঠাৎ পেছন থেকে বলে বসেন, এর চেয়ে অকৃতজ্ঞ আর কাকে বলে। ভদ্রমহিলার নামটি জানবার চেষ্টা করেছিলে কী?

॥ তিন ॥

মানা। কামেট। কামেট আর মানা। মানা তেইশ হাজার আটশো

বাট ফুট আর কামেট পঁচিশ হাজার চারশো সাতচল্লিশ ফুট উঁচু। মানা উত্তর গাড়োয়ালে ৩০° ৫৩' উত্তর, ৭৯° ৩৭' পূর্ব এবং কামেট ৩০° ৫০' ১৩' উত্তর ও ৭৯° ৩৫'৩৭" পূর্বে অবস্থিত।

কামেট নিছক তুষারাবৃত পর্বতশিখর নয়। সোনার খনি—স্বর্ণশিখর। দূর থেকে দেখলে মনে হয় তাল তাল সোনার অঙ্গাভরণে সজ্জিতা কামেট। সে এক মনোমোহিনী রূপ। সে রূপে মনে রঙ লাগে, নেশা ধরায় চোখে।

সুলেখক, দার্শনিক ও বিখ্যাত বৃটিশ পর্বতারোহী ফ্রাঙ্ক এস. স্মাইথ কামেটের রূপে মজেছিলেন। সেটা ১৯৩১ সালের কথা। অপরিমেয় ধৈর্যের বিনিময়ে, অশেষ ক্লেশ ভোগ করে নিখাদ আন্তরিকতার ফলস্বরূপ স্মাইথ সেবারে সহযাত্রী হোলডসওয়ার্থকে সঙ্গে নিয়ে কামেট আরোহণ করেছিলেন। শীর্ষদেশে পৌঁছে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। পঁচিশ হাজার চারশো সাতচল্লিশ ফুট উঁচুতে পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে ছেড়ে দেখছিলেন কামেটকে। কি রূপ! এক কথায় বড়ই অপরূপা কামেট।

দেখছিলেন এরই ফাঁকে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। নাম জানা আর অজানা কত না তুষারমৌলী শৃঙ্গ। হঠাৎ এক জায়গায় এসে তাঁর দৃষ্টি বাধা পেল। তারপর সেদিকে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ ধরে। এ যে রূপবতী মানা। রূপের আগুনে জ্বলছে। চোখ ফেরানোই কঠিন। অর্থাৎ প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়লেন স্মাইথ। ভাবলেন তখনই ছুটে যাবেন সেখানে, মানার কাছে। কিন্তু বাস্তবে তা আর সম্ভব হল না। অনেক পুঞ্জিত ব্যথা আর ক্ষোভ নিয়ে ফিরে গেলেন দেশে। কিন্তু মনে মনে বুঝি বা সংকল্প ছিল—আসতেই হবে এখানে।

এসেছিলেন স্মাইথ। সুন্দরী মানার রূপের নেশায় বুঁদ হয়ে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে আবার এলেন তিনি। সেটা ছিল ১৯৩৭ সাল। অশেষ ক্লেশ আর অনিশ্চয়তার মধ্যে দক্ষিণ গাত্র বেয়ে তিনি সেবারে মানার শীর্ষে আরোহণ করেন।

তারপরে আর কেউ মানা শিখরে আরোহণ করতে পারে নি আজ পর্যন্ত। দু'-তিনটি অভিযানও সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু মানা কাউকে পথ দেয় নি। ভারতীয় পর্বতারোহীদের কাছে মানা আজও অজেয় হয়ে রয়েছে। তাই মানা পর্বতারোহীদের এক বিরাট বিস্ময়।

পর্বত অভিযাত্রী সঙ্ঘের মানাকে ঘিরে অভিযান চালানোর এটি দ্বিতীয় প্রয়াস। ১৯৬১ সালে এই বিশ্বদেব বিশ্বাসের নেতৃত্বেই অনুরূপ একটি অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুর্যোগ-পূর্ণ আবহাওয়ার জন্য সেবারে শীর্ষদেশের মাত্র কয়েক 'শ ফুট নিচের থেকে অভিযান পরিত্যক্ত হয়ে যায়। সেদিক থেকে বিচার করলে এবারের অভিযানে মানা আমাদের কাছে বিরাট চ্যালেঞ্জ স্বরূপ।

মানার চেয়ে কামেটের উচ্চতা বেশি হলেও ইতিপূর্বে ভারতীয় পর্বতারোহীরা সেখানে বিজয় কেতন উড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেটাও ছিল এভারেস্ট আরোহণের বছর, অর্থাৎ ১৯৫৩ সাল। মেজর এন. ডি. জয়ালের নেতৃত্বে সেবারে শেরপা আঙ. থ্যাকারে, দা নাম-গিয়াল, আঙ্ তেম্বা, লাকপা দোরজি এবং জয়াল নিজে কামেট আরোহণের সুদুর্লভ গৌরব অর্জন করেন।

অনেক কথাই মনে পড়ছে। এবারে আমরা যে অভিযানের জন্য বেরিয়েছি তা নানা দিক থেকে অত্যন্ত চমকপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক। প্রথমত, বাংলাদেশ থেকে ইতিপূর্বে আর কখনও এত উঁচু দু-দুটো পর্বতশৃঙ্গে এক সঙ্গে অভিযান চালানোর পরিকল্পনা হয় নি। এমন কি ভারতবর্ষের বেসরকারী পর্বতাভিযানেও এর কোন নজির নেই বলেই আমার ধারণা।

দ্বিতীয়ত, ফ্রাঙ্ক স্মাইথ যে-পথে মানা আরোহণ করেছিলেন, আমরা সে পথে আরোহণ করব না। সম্পূর্ণ এক নতুন পথে আরোহণের চেষ্টা করা হবে। এজন্য মানার উত্তর গাত্রকে বেছে নেওয়া হয়েছে। অভিজ্ঞ পর্বতারোহী স্মাইথ অবশ্য মানার এই উত্তর দিকটাকে আল্পসের আইগার পর্বতের উত্তর দিকের পথের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

শুধু তাই নয়, তাঁর মতে এ পথ অত্যন্ত বিপজ্জনক, বিপদসঙ্কুল। এ পথে অগ্রসর হওয়ার কল্পনা করতেও নাকি ভয় হয়। কাজে কাজেই এই অসম্ভব ও বিপজ্জনক পথে মানা আরোহণের পরিকল্পনাকে অভিনব বলা যেতে পারে।

তৃতীয়ত, মানার শিখরে আজও কোন ভারতীয়ের পদার্পণ সম্ভব হয়ে ওঠে নি। আর এই একটি মাত্র কারণেই এই অভিযানের গুরুত্ব অপরিসীম। এবং সে কথা ভাবতেই সারা দেহে প্রচণ্ড শিহরণ জাগে। রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে।

আর কামেট? ইতিপূর্বে ভারতীয় পর্বতারোহীরা কামেট শিখরে আরোহণ করলেও কামেটের 'চার্ম' বিন্দুমাত্রও কমে যায় নি। কেননা এর উচ্চতা, প্রাকৃতিক বাধা-বিপত্তিগুলি পর্বতারোহীদের সামনে সমান চ্যালেঞ্জ নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে আজও।

সুতরাং এই অভিযানকালে আমরা যদি দুটো শৃঙ্গই আরোহণ করতে পারি, তাহলে তা এক নতুন রেকর্ড হবে। বাংলাদেশ তথা ভারতীয় পর্বতারোহণের ইতিহাসে এক অভিনব নজিরের সৃষ্টি হবে।

কিন্তু তা কি সম্ভব হবে? একই যাত্রায় এত উঁচু উঁচু কঠিন দু' দুটো শৃঙ্গ আরোহণ করা কী সহজসাধ্য ব্যাপার?

যাত্রার প্রাক্কালে সাংবাদিকরা অভিযানের সহনেতা নিমাইদাকেও ঠিক একই প্রশ্ন করেছিলেন। নিমাইদা এর জবাবে বলেছিলেন—এবার আমরা মানা জয় করবই, কামেটও। ১৯৬১ সালে আমরা মানায় উঠবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় অভিযাত্রীদের সেই প্রথম প্রয়াস সার্থক হয় নি। সহনেতা নিমাইদা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে আরো বলেছেন—১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে মানা শিখরে আরোহণ করা সম্ভব হবে এবং ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ২২শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমরা কামেটের শিখরে আরোহণ করব।

আমাদের প্রথম লক্ষ্য—মানা, দ্বিতীয় কামেট। দু'টি শৃঙ্গের জন্য একটিই বেস ক্যাম্প বা মূল শিবির স্থাপন করা হবে

অভিযানের যাবতীয় রসদ এবং সাজসরঞ্জাম মজুদ করা হবে ঐ মূল শিবিরে। পরে সেখান থেকে তা আবার ক্রমশ শিবির ভিত্তিক অনুসারে ওপরে পাঠানো হবে।

মানা আরোহণের জন্য মূল শিবির ছাড়াও আমাদের অতিরিক্ত পাঁচটি শিবির স্থাপন করতে হবে। তবে তার মধ্যে তিনটি শিবিরই কামেট আরোহণকালেও থাকবে। কামেটের জন্য লাগবে মোট ছ'টি। মানার তিন নম্বর শিবিরটিই কামেট আরোহণের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হবে।

সমগ্র অভিযানটাই একটা নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হবে। তার জন্য প্ল্যানও খাড়া করা হয়েছে। কোনমতেই তার অন্যথা হবে না। তবে নেহাৎ কোন দৈব-দুর্বিপাক ঘটলে অবশ্য আলাদা কথা। তখন সামান্য হেরফের কিছু হতেও পারে। তা না হলে দিন-ক্ষণ হিসেব করে যে দিনপঞ্জী স্থিরীকৃত হয়েছে, তা হল : ২১শে সকালে হরিদ্বার পৌঁছে সেদিন বাসে করে শ্রীনগরের পথে রওনা হব। শ্রীনগরে রাত্রি যাপন করে পরের দিন অর্থাৎ ২২ তারিখে বাসে করে আমরা যাব যোশীমঠ। ২৩শে যোশীমঠ থেকে মালারী। দীর্ঘ বাস-যাত্রার ইতি হবে এখানেই। পরের দিন থেকে পায়ে হাঁটা শুরু হবে। বলতে গেলে অভিযান শুরু হবে সেদিন থেকেই। প্রথম দিন আমরা মালারী থেকে নিতি যাব। নিতি থেকে মূল শিবিরের পথ দু'দিনের। বসুধারাতলে আমাদের মূল শিবির হবে।

২৬শে এবং ২৭শে আগস্ট মূল শিবিরে সমস্ত মালপত্র ঢেলে নতুন করে 'রিপ্যাকিং' করার জন্য ধার্য করা হয়েছে। এক নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করা হবে আঠাশ তারিখে। ৭ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাকি আর চারটি শিবির লাগানোর কাজ শেষ করতে হবে। সর্বশেষ শিবির অর্থাৎ পাঁচ নম্বর ক্যাম্প প্রায় ২৩,০০০ ফুট উঁচুতে হবে। মোট কথা ৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে মানা আরোহণ করে পুনরায় আমাদের তিন নম্বর শিবিরে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

এই তিন নম্বর ক্যাম্পই হবে কামেট আরোহণের মূল এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। এখানেই সমস্ত রসদ ও সাজ-সরঞ্জাম এনে জড়ো করা হবে যাতে ওপরের শিবিরে কোন অসুবিধা না হয়।

তিন নম্বর শিবির থেকে কামেট আরোহণের জন্য অতিরিক্ত চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শিবির লাগাতে হবে। শিবিরগুলি হবে যথাক্রমে ২২,০০০ ফুট, ২৩,৫০০ ফুট এবং ২৫,০০০ ফুট উঁচুতে। আর এই সর্বশেষ শিবির অর্থাৎ ছ'নম্বর ক্যাম্প থেকেই কামেট আরোহণের প্রচেষ্টা চলবে। আবহাওয়া খারাপ, ইত্যাদি নানান অসুবিধার কথা স্মরণে রেখে এর জন্য মোট আট দিন সময় রাখা হয়েছে। আশা করি এই প্রশস্ত সময়ের মধ্যে কামেট আরোহণ করতে বিশেষ কোন বেগ পেতে হবে না।

হঠাৎ ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে আসে। আমি তাড়াতাড়ি বাঙ্ক থেকে নিচে নেমে জানালার ধারে গিয়ে বসি। সবে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। দূরে মিটি মিটি আলো দেখা যাচ্ছে। এ আলো আমার খুব পরিচিত। আর একটু পরেই ট্রেন গিয়ে ঢুকবে লক্ষ্ণৌ স্টেশনে।

ভীষণ একঘেয়ে লাগছিল। সেই যে গত কাল রাতে কামরায় উঠেছি, তারপর থেকে ক্রমাগত শুয়ে-বসে সময় কাটাতে হচ্ছে। আরো এক রাত এখনও বাকি। গায়ে হাত-পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা ধরে গিয়েছে। গাড়ি থেকে নিচে নেমে কিছুক্ষণ পায়চারি কিম্বা দৌড়ঝাঁপ না করতে পারলে এ ব্যথা বোধ হয় সারবে না। মনে মনে তাই ঠিক করে রেখেছিলাম লক্ষ্ণৌ স্টেশনে নেমে পায়চারি করে ব থাটা সারিয়ে নেব। তাই জানালা দিয়ে উঁকি দিতেই যখন লক্ষ্ণৌ শহর নজরে এল, তখন স্বভাবতই মন আমার আনন্দে নেচে ওঠে।

স্টেশনে গাড়ি থামতেই বিশ্বদেবদা তাড়াতাড়ি কামরা থেকে নেমে গেলেন। তাঁর সঙ্গে নিমাইদা, মদনদা এবং প্রদ্যোৎদাও গেলেন। দার্জিলিং থেকে আমাদের অভিযানের শেরপা এবং হাই অলটিচুড পোর্টার বা লকুলদের আসার কথা। তারা

সকলেই এখানে আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই ট্রেনেই হরিদ্বার যাবে।

বেশ ভীড় স্টেশনে। কিছু লোক এখানে নেমে গেল। উঠলও অনেকে। আলো ঝলমল স্টেশনে ঘুরেফিরে তাই দেখছিলাম। যাত্রীদের দৌড়োদৌড়ি হুড়োহুড়ি এবং ফেরিওয়ালাদের চিৎকারে বেশ সরগরম লক্ষ্ণৌ স্টেশন।

হঠাৎ দূরে নজর পড়তেই দেখি বিশ্বদেবদা হন্তদন্ত হয়ে এদিকে আসছেন। ঠিক তাঁর পেছনেই শেরপা আর লকুলের দল। প্রায় প্রত্যেকেরই পরনে হাফ-প্যাণ্ট আর গায়ে নেটের গেঞ্জি। পিঠে ভারি রুকস্যাক। গরমে তারা রীতিমত ঘামছে। ঠাণ্ডা জায়গার মানুষ গরমে এলে কি যে কষ্ট পায় তা এদের দেখলে বোঝা যাবে। বেচারাদের চোখ-মুখ দেখে আমার ভীষণ কষ্ট হল।

ওরা আমাদের দেখেই কপালের কাছে হাত এনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে 'স্যালুট' করল। তারপর একগাল হেসে প্রত্যেকে হাতে হাত মেলাল আমাদের। আমরা বুকে টেনে আলিঙ্গন করলাম। এখন থেকেই তো ওরা আমাদের সুখ-দুঃখের অন্তরঙ্গ সাথী। আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের উপর নির্ভরশীল।

ছুঞ্জে, সোনা আর গ্যালজেনকে দেখে আমি রীতিমত বিস্মিত হলাম। ওরাও আমাকে দেখে বিস্মিত। ওরা তিনজনেই আমার পুরোন বন্ধু। হিমালয়ে আমরা ইতিপূর্বে একসঙ্গে হেঁটেছি দিনের পর দিন। এক তাঁবুতে রাত্রি যাপন করেছি। তুষার ঝরা দিনে প্রবল ঠাণ্ডায় আমরা পথ হারিয়ে ঘুরেছি এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বিমর্ষ, চিন্তা-ক্লিষ্ট মনে। আবার সূর্যকরোজ্জ্বল দিনে কত না চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে পৌঁছেছি এক শিবির থেকে আরেক শিবিরে। ওদের দেখে আমার সেই-সব অতীতের সুখ-দুঃখ হাসি-আনন্দে ভরা দিনগুলোর কথা মনে পড়ল। বন্ধুর পথে চলতে চলতে আজ অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আমরা বাঁধা পড়েছি। ওদের পেয়ে আমি আনন্দে আত্মহারা, ওরাও আমাকে পেয়ে আনন্দিত।

পরদিন সকালে।

হরিদ্বার। একান্ন পীঠের অন্যতম পীঠস্থান। সতীর জঠরের অংশ পড়েছিল এখানে। তাই হিন্দুদের অন্যতম তীর্থস্থানগুলির একটি হচ্ছে এই হরিদ্বার। অবাঙ্গালীরা হরিদ্বারকে বলেন হরদোয়ার। হর-কা-প্যারী এখানকার ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করতে পারলে অক্ষয় স্বর্গবাস নাকি অবশ্যম্ভাবী।

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। গাড়ি স্টেশনে থামতেই ঝাঁপিয়ে পড়ি প্ল্যাটফরমে। দু'দিন ট্রেনে থেকে বেশ হাঁপিয়ে উঠেছিলাম।

ধীরে ধীরে সকলেই ট্রেন থেকে নেমে আসে। নেতা আর সহনেতা আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। সহনেতা বললেন—প্রাণেশ, চল বাসের খবর নিয়ে আসি।

আমরা দু'জনে স্টেশনের কলকোলাহলের মধ্যে এগিয়ে চলি নিঃশব্দে। অদূরে সবুজ বনানীতে ছাওয়া সবুজ পাহাড়। কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে।

ভীড় ঠেলে আমরা স্টেশনের বাইরে আসি। আজই আমরা এখান থেকে বাসে করে যোশীমঠ অভিমুখে রওনা হব। উত্তরপ্রদেশ সরকার, বিনা ব্যয়ে আমাদের অভিযানের জন্য দু'খানা বাস ও একখানা লরির বন্দোবস্ত করেছেন। আমরা চলেছি তারই সন্ধানে।

—নমস্তে জী। ভীড়ের মাঝখান থেকে একজন মধ্যবয়সী লোক একগাল হেসে হাতজোড় করে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। আমরাও প্রতিনমস্কার করি।

—আপ লোগ কলকাত্তাসে আয়া? মানা-কামেট যানেওয়ালী পার্টি হ্যায়? আগন্তুক ভদ্রলোক হেসে জিজ্ঞেস করে।

—জী হাঁ। লেকিন আপ? নিমাইদা ভারি গলায় ছোট্ট প্রশ্ন করেন।

—ম্যায় লরিকা ড্রাইভার হুঁ।

—বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা। নিমাইদা লোকটির পিঠ চাপড়ে বলেন—লরি বাস সব তৈয়ার হ্যায় পণ্ডিতজী?

লোকটির কপালে সিঁদুরের টিপ ছিল। বোধহয় নিমাইদা তাই দেখে 'পণ্ডিতজী' সম্বোধন করে থাকবেন। অবশ্য এদিককার রেওয়াজও তাই। পরিচিত আর অপরিচিতই হোক, সকলেই সকলকে পণ্ডিতজী বলে সম্বোধন করে।

তবে নিমাইদার এই সম্বোধনে লোকটি বেশ খুশিই হয়েছে বলে মনে হল। অত্যন্ত বিগলিতভাবে সে বলে—আপলোগকো লিয়ে গাড়ি সব তৈয়ার হ্যায় হুজুর। আভি আপ ফরমাইয়ে।

—গাড়ি কিধার হ্যায় পণ্ডিতজী? নিমাইদা অত্যন্ত মোলায়েম ভাবে জিজ্ঞেস করেন।

—নজদীগই হ্যায় সাব। উধার সরকারী ডিপো মে। আভি লে আনা? লোকটি ত্রস্ত পায়ে পিছিয়ে যায়।

নিমাইদা তাকে বাধা দিয়ে বলেন, লেকিন আপ লোগ তৈয়ার হ্যায় কী নেই পহেলী···

—জী সাব, হাম তিনো ড্রাইভার তৈয়ার হ্যায়। অর্ডার দেনে সে আভি পৌঁছচ্ যায়েগা।

বড় ভাল লাগে লোকটির কথাবার্তা, আচার-আচরণ। আজ-কালকার দিনে এরকম বড় বেশি একটা সহজে দেখা যায় না।

নিমাইদা বলেন, ঠিক হ্যায় পণ্ডিতজী, আপ লে আইয়ে গাড়ি।

আদেশ পাওয়া মাত্র লোকটি ঘুরে দাঁড়ায়। তারপর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে চলে সরকারী ডিপোর দিকে। আমরাও তাকে অনুসরণ করি।

বাসের অন্য দু'জন ড্রাইভার নিকটেই অপেক্ষা করছিল। পণ্ডিত-জীকে দেখেই তারা হাতের বিড়ি ফেলে দিয়ে এগিয়ে আসে কাছে। তারপর তাদের মধ্যে কি যেন কথাবার্তা হয়। মুহূর্তের মধ্যে তারা গাড়িতে উঠে স্টার্ট দেয়। সামান্য একটু পথ। ডিপো থেকে স্টেশনে আসতে দু'মিনিটও সময় লাগল না।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে সোজা স্টেশনে গিয়ে ঢুকি। ব্রেকভ্যান থেকে রেলের লোকেরাই আমাদের মালপত্র নামিয়ে রাখছিল প্ল্যাট-ফরমের ওপর। সুজন, নারায়ণ আর প্রদ্যোৎদা উপস্থিত থেকে তদারকি করছিল।

পণ্ডিতজী আমার পাশেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছিল। স্তূপীকৃত মালপত্র দেখে সে বিস্ময় প্রকাশ করে—বহুত্ সামান হ্যায় সাব।

—জী হাঁ।

—কেত্না হোগা?

—ছে টন।

—ছে ট…ন…! চোখ দুটো গোল গোল করে অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে পণ্ডিতজী। ঠিক তার পরেই সে আবার প্রশ্ন করে, আদমী কেত্না?

—হাম লোগ আভি তিশ হ্যায়…

—তিশ আদমী?

—জী হাঁ।

—বহুত লম্বে পার্টি আপকা। পণ্ডিতজী হাসতে হাসতে মন্তব্য করে।

বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে সকলের জামা-কাপড় সপসপ করছে। তার ওপরে মাঝে মাঝেই দমকা হাওয়া এসে কাঁপিয়ে দিচ্ছে সর্বাঙ্গ। তা সত্ত্বেও সদস্য শেরপা আর লকুলের দল অসামান্য উৎসাহভরে সমস্ত মালপত্র লরিতে, বাসের ছাতে নিয়ে বোঝাই করল। বৃষ্টি বা ঠাণ্ডাকে কেউ তেমন ভ্রূক্ষেপই করল না।

মালপত্র তুলে দিয়ে সকলেই এসে জড়ো হয় চায়ের দোকানের সামনে। হরিদ্বারে পৌঁছুনো ইস্তক কেউ-ই দাঁতে কুটোটি কাটবার সময় পাই নি। একনাগাড়ে শুধু কাজ করতে হয়েছে, তাই সকলেই বেশ জুত করে বসে যাই দোকানের সামনে। চোখে-মুখে

প্রত্যেকেরই আনন্দের ইশারা। আপাতত উদ্বেগের আর কোন কারণ নেই। গরম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আমরা আরো চাঙ্গা হয়ে উঠি।

এখানেই দেখা হল তাপস ভট্টাচার্যের সঙ্গে। কাব্রুডোম অভিযানের অন্যতম নায়ক। ছ'ফুট দীর্ঘ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী তাপসদা। পাসাং ফুতারকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা থেকে প্রায় দিন দশেক আগে বেরিয়েছিলেন পথের সব বন্দোবস্ত করতে। অভিযাত্রীরা বিরাট লাট-বহর নিয়ে কোন কারণে যাতে পথিমধ্যে আটকা না পড়ে, তারই জন্য তাঁকে পাঠানো হয়েছিল।

অসম্ভব স্মার্ট, তৎপর, কষ্টসহিষ্ণু ও সদালাপী এই মানুষটি অভিযানের সত্যিই একটি সম্পদ। তাপসদাকে দেখলে মনে হবে পৃথিবীতে কোন কাজই এঁর কাছে অসম্ভব নয়। নয়কে হয় করতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তাপসদা গতকাল যোশীমঠ থেকে এখানে নেমে এসেছেন। কেনাকাটা, কুলীর বন্দোবস্ত, অভিযাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা, সব কিছু পাকা করেই তবে তিনি আমাদের 'রিসিভ' করতে এসেছেন।

বিশ্বদেবদা তাঁকে সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন। আবহাওয়ার প্রসঙ্গ তুলতেই তাপসদা অত্যন্ত বিমর্ষ বোধ করেন। ম্লান কণ্ঠে তিনি বলেন—ওপরে বেশ বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাস্তায় দু'-এক জায়গায় ধস নেমে অবরোধ সৃষ্টি করে আছে। জানি না আজ সে-সব পরিষ্কার হয়েছে কিনা।

—পরিষ্কার হয়ে থাকলে ভাল, আর না হলেও কিছু যায় আসে না তাপস! পর্বতাভিযানে বেরিয়ে কোনই বাধা-বিপত্তির মুখোমুখী হব না, এটা কি হয়? বিশ্বদেবদা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করেই আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে…

বিশ্বদেবদাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই তাপসদা বলে ওঠেন—

আজকে এখানে আসবার আগে আমি অবশ্য খোঁজ নিয়ে এসেছি। যোশীমঠ পর্যন্ত আপাতত রাস্তা ক্লিয়ার আছে।

—সে সব পরে দেখা যাবে। এখন চিন্তা করে কোন লাভ নেই। চল, অনেক বেলা হয়ে যাচ্ছে। আমরা গাড়িতে গিয়ে উঠি, মদনদা তাড়া লাগান।

—হ্যাঁ, তোরা গিয়ে সব গাড়িতে ওঠ। এখন না বেরুতে পারলে কিন্তু হৃষিকেশে আর দুপুরের গেট পাবো না আমরা। তাতে ভীষণ মুশকিল হবে—তাপসদা টুপি পরতে পরতে মদনদার কথাকে সমর্থন করেন।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলে গিয়ে বাসে উঠে বসি। বাস চলতে শুরু করে। পীচঢালা পথ দিয়ে, গভীর বনের ভেতর দিয়ে, নদীনালা ডিঙিয়ে গাড়ি ছুটে চলে হৃষিকেশের দিকে। মাত্র পনের মাইল পথ। গাড়ি এসে থামে হৃষিকেশ বাস স্ট্যাণ্ডে। মধ্যাহ্নের আহার এখানেই সেরে নিতে হবে। নয়তো পরে আর সুযোগ পাওয়া যাবে না।

হৃষিকেশ হিমালয়ের দ্বারদেশে। কেদার-বদরী, গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী যাবার প্রবেশ তোরণ। হিমালয়ের প্রবেশপথ আর স্বর্গের শেষ সীমানা এই হৃষিকেশ। হিমালয়ের ওপরেই রয়েছে স্বর্গলোক, ইন্দ্রের অমরাবতী, ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, নন্দনকানন, তপোবন ইত্যাদি কতকিছু। এখানে যারা আসে, তারা নাকি স্বোপার্জিত পুণ্যবলেই আসে।

হৃষিকেশের অদূরেই লছমণঝুলা। আগেকার দিনে কেদার-বদরী পরিক্রমায় যেতে হলে এই ঝুলার উপর দিয়েই হেঁটে যেতে হত। তখন এই 'ঝুলা' তীর্থযাত্রীদের কাছে রীতিমত ভয়ঙ্কর ও বীভৎস মনে হত। কারণ মর্ত্য ও স্বর্গে সংযোগরক্ষাকারী এই ঝুলা পার হতে গিয়ে বহু তীর্থযাত্রী গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। তাই এই ঝুলা তীর্থযাত্রীদের কাছে এক চরম পরীক্ষার বিষয়। ঝুলা

পারাপারের মধ্য দিয়েই প্রমাণ হত পরিক্রমা সফল হবে কি হবে না।

সেই ভয়ঙ্কর ঝুলা আজ আর নেই, তার পরিবর্তে তৈরী হয়েছে এক মনোরম মজবুত সেতু। ১৮৮০ সালে শেঠ সুরজমল ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা বহু অর্থ ব্যয় করে এই সেতু তৈরি করে দিয়েছেন। কেদার-বদরী পরিক্রমায় অবশ্য আজ আর এই সেতু পার হতে হয় না।

গঙ্গার ওপারে স্বর্গাশ্রম, গীতাভবন। এপারে তপোবন, শিবানন্দ আশ্রম ইত্যাদি। গীতাভবনের ওপরে নীলকণ্ঠ পাহাড়। নীলকণ্ঠ শিবের মন্দির আছে সেখানে।

আবার যাত্রা শুরু হল। পাহাড়ী পথ বেয়ে বাস ছুটে চলে। একপাশে ঘন বন-জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়। আর একপাশে নিচে, বহু নিচে উজ্জ্বল উচ্ছল গঙ্গা।

হৃষিকেশ থেকে বাইশ মাইল একটানা চলার পর বাস এসে থামল বিয়াসিতে। শাল-সেগুনের স্নিগ্ধ ছায়ায় ঘেরা ব্যাস-ঘাট। গঙ্গার ওপারে বর্তমান ব্যাস-ঘাট। ব্যাসগঙ্গা এসে ব্যাস-ঘাটের পাশ দিয়ে ভাগীরথীতে মিশেছে।

মুহূর্তের মধ্যে ওপর থেকে কয়েকটি বাস, লরি ও প্রাইভেট গাড়ি এসে জড়ো হল বিয়াসির গোলাকৃতি চত্বরে। শেষ গাড়িটি ঢুকল সবুজ নিশান নিয়ে। এ হচ্ছে রাস্তা ক্লিয়ারের সঙ্কেত। গেট খুলে দেওয়া হল। পুলিশ হুইসল বাজিয়ে নির্দেশ দিতেই আবার গাড়ি চলতে শুরু করে।

আমাদের ড্রাইভার হর্ন দিয়ে আমাদের বাসে ওঠবার জন্য আহ্বান জানাল। শালপাতার ওপর নিঃশেষ প্রায় ছোলা সেদ্ধ আর আলু জিভ দিয়ে টেনে নিই মুহূর্তের মধ্যে। পরে পাতা চাটতে চাটতে ছুটে গিয়ে বাসে উঠি। ধ্রুবদা তাই দেখে হাসতে হাসতে বলেন—দেখিস, পাতাডা আবার খাইয়া ফেলাইস্ না য্যান।

গোঁ গোঁ শব্দে আমাদের বাস অন্য গাড়িগুলির পিছু নিয়ে একলাইনে চলতে থাকে। সঙ্কীর্ণ পথ। ওভারটেক করার কোনই প্রশ্ন ওঠে না। আগাগোড়া সবটুকুই 'ওয়ান ওয়ে' বলে এসব জায়গায় গেট প্রথা চালু। তাতে নির্দিষ্ট পথ যেমন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাড়ি দেওয়া যায়, তেমনি দুর্ঘটনা ঘটারও সম্ভাবনা কম থাকে।

এ পথে আমি আগেও এসেছি। এসেছে অভিযানের আরো অনেক সদস্যই। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন জানি আশেপাশের সব কিছুই আমার কাছে নতুন লাগছে। নিচে উচ্ছল গঙ্গার নীলাভ জলরাশির দিকে তাকালে মন ভরে উঠেছে এক অনির্বচনীয় আনন্দে।

বিয়াসি থেকে দেবপ্রয়াগ বাইশ মাইল। হৃষিকেশ থেকে মোট দূরত্ব চুয়াল্লিশ মাইল। বাসে প্রায় ঘণ্টা চারেক সময় লাগে। দেবভূমি দেবপ্রয়াগ, ভাগীরথী ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থল। গঙ্গার দুই ধারা দু'দিক থেকে এসে মিশেছে মহা উল্লাসে। সমুদ্রতল থেকে এ স্থানের উচ্চতা মাত্র ১৫৫০ ফুট।

দেবভূমি দেবপ্রয়াগের রঘুনাথজীর মন্দির বিখ্যাত। শোনা যায় শঙ্করাচার্য এ মন্দিরটি স্থাপন করেছিলেন। এখানকার পূজারী ব্রাহ্মণরা টিহরীর রাজগুরু দেবশর্মার বংশধর। তপস্বী দেবশর্মা এখানে কঠোর তপস্যা করেন। ভগবান বিষ্ণু তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে লক্ষ্মীদেবীকে নিয়ে আসেন বর দান করতে। দেবশর্মার নাম অনুসারে এ স্থানের নাম হয় দেবপ্রয়াগ।

বাস অতি অল্প সময়ের জন্য দাঁড়াবে বলে আর সঙ্গমে নেমে গেলাম না কেউ। ফার্লংখানেক পথ পিছিয়ে গেলে সঙ্গমস্থল ও মন্দির। বাস রাস্তা থেকে দেখা যায়। দিলীপদা কিছু ছবি নেবেন বলে আমরা উভয়ে সেদিকে এগিয়ে চললাম।

সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ গাড়োয়ালের প্রাচীন রাজধানী শ্রীনগরে এসে

গাড়ি থামল। আজকের মত এখানেই আমাদের যাত্রা শেষ। আবার আগামীকাল ভোরে বাস ছাড়বে।

১৯৬২ সালে নীলগিরি পর্বতাভিযানের সময় আমি এপথে এসেছিলাম। চার বছরের ব্যবধানে শ্রীনগরের কত পরিবর্তন হয়ে গেছে! হিমালয়ের প্রাচীরে ঘেরা প্রশস্ত এই উপত্যকা আজ নব কলেবরে বিরাজমান। আলো ঝলমল শ্রীনগর কলকাকলিতে মুখর। হোটেল রেস্তোরাঁ, সিনেমা হল—কোনকিছুই বাদ নেই এখানে। শ্রীনগর এখন রীতিমত শহর হয়ে গেছে।

হৃষিকেশ থেকে শ্রীনগর ৬৭ মাইল। অলকানন্দা অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে এই নগরীকে। শহরের উচ্চতা ১৬০০ ফুট।

শ্রীনগর বৃটিশ গাড়োয়ালের জেলাসদর ছিল। এখানে বিখ্যাত প্রাচীন শ্রীদেবীর মন্দির ছিল। শ্রীদেবী খুব জাগ্রতা ছিলেন। শোনা যায় মন্দিরে গিয়ে মায়ের পুজো দিতে কেউ সাহস করত না। কারণ মন্দিরে গেলে কেউ আর কখনও ফিরে আসতে পারত না।

মায়ের এই সংহারকারিণী রূপের কথা শুনে ভগবান শঙ্করাচার্য তপস্যা শুরু করেন। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবী তাঁকে বর দিতে চান। শঙ্করাচার্য প্রার্থনা করেন, ভক্তরা যেন মন্দিরে গিয়ে মায়ের পুজো দিতে পারেন।

শুনে দেবী রুষ্টা হন। তা কি করে সম্ভব? তিনি যে মায়াবদ্ধ জীবের সংহার করতে এখানে অধিষ্ঠিতা!

কিন্তু শঙ্করাচার্যও নাছোড়বান্দা। এ ছাড়া তাঁর আর কোন বর প্রার্থনা করার নেই।

অগত্যা দেবী প্রার্থনা পূরণ করেন। মন্দিরে গিয়ে দলে দলে নরনারী পুজো দিয়ে আসতে লাগল।

সেই জাগ্রতা শ্রীদেবীর নামেই এই শ্রীনগর।

আমরা টুবিস্ট অফিসের লম্বা ঘরে ঠাঁই নেব স্থির করলাম। একেবারে বাস রাস্তার উপরেই টুরিস্ট লজটি। বেশ ছিমছাম ও

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। রাত্রিবাসের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাসের ছাত থেকে আগেই নিয়ে এসে ঘরে রেখে দিলাম। খাওয়া দাওয়ার পরে আর অযথা ছুটাছুটি করতে হবে না।

রাস্তার ওপারে হোটেলের ছড়াছড়ি। টুরিস্ট লজের বারান্দা থেকেই দেখা যায়। মদনদা গেলেন রাতের আহারের খোঁজ-খবর নিতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে তিনি ফিরে এলেন। বললেন—মাংস-ভাত তৈরি। তোমরা গিয়ে খেয়ে আসতে পার। গরম গরম পাওয়া যাবে।

আমরা পথশ্রমে কাতর। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম করতে পারলেই ভাল হত। কিন্তু দিলীপদা, প্রদ্যোৎদা, শিবশঙ্করদা এবং আমি ঠিক করলাম সিনেমা দেখতে যাব। তাই সময় নষ্ট না করে আমরা ক'জনে তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে সিনেমা দেখতে চললাম।

॥ চার ॥

যাত্রীদের চেঁচামেচি আর বাসের হর্ন শুনে পরদিন সাতসকালে ঘুম ভাঙল। সকালের গেট এখনই খুলবে। এটা না ধরতে পারলে দুপুর দুটো নাগাদ আবার গেট। কিন্তু তার জন্য বসে থাকবার কোন অর্থ হয় না। পাহাড়ী পথ, এখানে কখন কি হয় আগে থেকে কিছু অনুমান করা কঠিন। কোন কারণে মাঝপথে আটকে গেলে তখন দুর্ভোগের একশেষ হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চটপট সকলে তৈরি হয়ে নিই। তা ছাড়া যেমন করে হোক আজই আমাদের যোশীমঠ পৌঁছুতে হবে। অন্ততঃ সে রকমই প্ল্যান-প্রোগ্রাম আছে।

বেশ শীত শীত লাগছে। এ সময়ে একটু গরম গরম চা হলে ভাল হত। একথা ভাবতে না ভাবতেই দেখি একটা ছোকরা চা নিয়ে এসে হাজির। তার পেছনে মদনদা। হাতে তার বিস্কুট। সবাইকে

বিস্কুট দিতে দিতে তিনি বলেন—আপাতত: চা-বিস্কুট খাও। পরে দেখব আর কী করা যায়।

চা খেয়ে আমরা সকলে বাসে উঠে বসি। দিলীপদা তাঁর মুভি ক্যামেরা নিয়ে উঠলেন সামনের লরিতে। শেরপা পাসাংও সেখানে গেল। দিলীপদার সহকারী হিসেবে সে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। ক্যামেরা স্ট্যাণ্ড, ফিল্মের বাক্স ইত্যাদি ফটোগ্রাফির সমস্ত সরঞ্জাম এখন থেকে তারই হেফাজতে। কাল থেকেই তাকে দিলীপদার সঙ্গে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে দেখছি।

জানালার ধারেই বসেছিলেন প্রদ্যোৎদা। বহু দূরে সামনের রাস্তার দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পরে তিনি হঠাৎ বলে ওঠেন—কি দুর্ভোগই না পোহাতে হয়েছিল সেবারে। ১৯৬১ সালে ধস নেমে রাস্তা অবরুদ্ধ হওয়ায় আমরা সেবারে এই শ্রীনগরে আটকা পড়েছিলাম। এখান থেকেই আমাদের হাঁটা শুরু হয়েছিল। কুলী সংগ্রহ করতে সেবারে রীতিমত হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলাম। ডাবল রেট দেওয়া হবে শুনেও কোন কুলী যেতে রাজি হয় নি। সে একটা এক্স পডিশন হয়েছিল বটে।

—হ, বেস ক্যাম্পে যাইতে যাইতেই আমাগো আমরক্ত বাইরইয়া গেছিল। ধ্রুবদা পিছনের সিট থেকে হঠাৎ বলে ওঠেন।

প্রদ্যোৎ চ্যাটার্জি সেবারই প্রথম মানা অভিযানে যোগদান করেন। পাতলা ছিপছিপে এই মানুষটি নাকি সেবারের অভিযানে নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে যে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দেন, তাতে সকলেই বিস্ময় বোধ করেন। সেই নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্যই ১৯৬৪ সালে তাঁকে কাব্রুডোম অভিযানে নেওয়া হয়। পর্বতারোহণের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম সম্পর্কে ইনি সবিশেষ ওয়াকিবহাল। ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে প্রদ্যোৎদার নাম আছে। হৃষিকেশ পার্কে আজও তিনি নিয়মিত ফুটবল খেলেন। এক সন্তানের জনক প্রদ্যোৎ চ্যাটার্জি

একজন ভাল ক্লাইম্বার হিসেবেও ইতিমধ্যেই বেশ সুনাম অর্জন করেছেন এবং প্রদ্যোৎদা একজন ভাল স্টিল ফটোগ্রাফার।

রুদ্রপ্রয়াগে খানিকক্ষণের জন্য বাস থামল। পাহাড়ে ঘেরা রুদ্রপ্রয়াগ পঞ্চপ্রয়াগের অন্যতম প্রয়াগ। মন্দাকিনী ও অলকানন্দার সঙ্গম স্থল। শ্রীনগর থেকে মাত্র এগারো মাইল পথ।

কথিত আছে দেবর্ষি নারদ একসময় রুদ্রনাথ দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় এখানে তপস্যা করেছিলেন। মহাদেব তাঁর তপস্যায় খুশি হয়ে দেবর্ষিকে দর্শন দান করেন। তারপর থেকেই শিব রুদ্রনাথ রূপে এখানে প্রতিষ্ঠিত।

বাস থেকে নেমে সকলেই প্রাতঃরাশ সেরে নিলাম। দুধ আর গরম-গরম জিলিপী। শেরপারা দেখলুম ছোলার ঘুঘনি আর পকোড়া দিয়ে প্রাতঃরাশ সারল।

ঝিমুনি আসছিল বাসের ঝাঁকুনিতে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ঠিক মনে নেই। দীর্ঘ একুশ মাইল পথ কখন যে পার হয়ে এসেছি খেয়াল নেই একটুও। শুধু মনে আছে, মদনদা একবার আপেল কাটবে বলে ছুরি চাইতে এসেছিলেন।

কর্ণপ্রয়াগে পৌঁছুতেই ধ্রুবদা ধাক্কা দিলেন—এই, ওঠ এ্যাহন। আর কত ঘুমাইবি? কিছু খাইবি তো, আমাগো সাথে আয়।

উঠে বসি সিটে। জানালা দিয়ে প্রথমেই নজরে পড়ে একটি মজবুত সেতু। তারই নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে অশান্ত পিণ্ডার গঙ্গা যার অপর নাম কর্ণগঙ্গা। ১৯৬৪ সালে পিণ্ডারী হিমবাহ যাবার পথে এই নদীটিকেই দেখেছিলাম খাতিতে। তবে সেখানে তার ভিন্ন নাম—পিণ্ডার নদী। কুমায়ুন হিমালয়ের পিণ্ডারী হিমবাহ থেকে উৎপত্তি এই নদীই গড়োয়ালে নেমে এসেছে নতুন নাম নিয়ে—পিণ্ডার গঙ্গা। একটু দূরেই অলকানন্দার সঙ্গে মিশেছে। সঙ্গমস্থলের উপরেই কর্ণেশ্বর শিব মন্দির।

এর পরে পার হয়ে এলাম নন্দপ্রয়াগ। অলকানন্দা ও নন্দাকিনীর

সঙ্গমস্থল। নন্দাকিনীর উৎপত্তি কুমায়ুনের ত্রিশূলীর হিমবাহ থেকে। এখানে লক্ষ্মীনারায়ণ ও নন্দরাজার মন্দির রয়েছে।

নন্দপ্রয়াগ থেকে খানিকটা পথ এগুনোর পরে হঠাৎ পাহাড়ের গা থেকে বড় বড় কয়েকটা পাথরের চাঁই হুড়মুড় শব্দে নিচে গড়িয়ে পড়ল। আর আমাদের ড্রাইভার তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে দিল। তা না হলে আমাদের অবস্থা কি হত, বলা মুশকিল।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলে গাড়ী থেকে রাস্তায় নেমে পড়লাম। তারপর সকলে ধরাধরি করে বড় বড় পাথরের চাঁই রাস্তা থেকে সরিয়ে অবরোধ মুক্ত করলাম। গাড়ি আবার ছুটে চলল সামনে।

পার হয়ে এলাম বিরেহীগঙ্গা বিধৌত চামোলি। এই বিরেহী পবে আবার অলকানন্দার সঙ্গে মিশেছে।

চারিদিকে পাহাড় ঘেরা চামোলি জেলা-শহর। স্কুল-হাসপাতাল থেকে শুরু করে সবকিছুই এখানে আছে। তবে এখনও এখানকার লোকসংখ্যা খুবই কম। বর্তমানে জেলা-শহরকে ঢেলে সাজানোর কাজ চলেছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে চামোলির গুরুত্ব বেড়ে যাবে। সেই সঙ্গে হু হু করে বেড়ে যাবে তার জনসংখ্যা, যেমন হয়েছে শ্রীনগরে।

পিপোলকোটিতে এসে বাস অনেকক্ষণ থামল। গত দু'দিন গায়ে-মাথায় বলতে গেলে একটুও জল পড়ে নি। ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছিলাম। বাস স্ট্যাণ্ডের ধারেই ছিল জলের কল। সেখানে বেশ জুতসই করে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিই। শেরপাদের দেখলুম অনেকেই জামা-কাপড় পরিষ্কার করে কেচে নিল।

১৯৬২ সালের নীলগিরি অভিযানের কথা মনে পড়ে। পিপোল-কোট থেকে মাইল দুয়েক দূরে বেলাকুচির কাছে বিরাট এক ধস নেমে সেবারে অবরোধ সৃষ্টি করেছিল। ফলে এখান থেকেই আমাদের হাঁটা শুরু করতে হয়েছিল।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার বাসে ওঠা গেল। আবহাওয়া খুব ভাল না হলেও মন্দের ভাল। অন্ততঃ বৃষ্টি হচ্ছে না। ছ'হাজার ফুট উঁচুতে উঠে এসেছি। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে।

বেলাকুচি পার হবার পরে পথের কয়েক জায়গায় ধসের সামনে পড়তে হল। তবে সদস্য এবং শেরপাদের হস্তক্ষেপে সে বাধা অপসারণ করতে বেশি বেগ পেতে হল না।

অবশেষে যোশীমঠে পৌঁছন গেল। তাপসদার ব্যবস্থানুযায়ী আমরা বিড়লা রেস্ট-হাউসে উঠলাম। পাসাং ফুতারের সঙ্গে দেখা হল। সে আমাদেরই অপেক্ষায় ছিল। আমাদের দেখতে পেয়ে সে ভীষণ খুশি।

রেস্ট হাউসে ঢুকে দেখি সারা এলাকা গম গম করছে। এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে ও বসে রয়েছে বহু গাড়োয়ালী মানুষ। তারা নিজেদের ভাষায় কি যেন আলাপ আলোচনা করছিল! আমাদের দেখে তাড়াতাড়ি সকলে উঠে দাঁড়ায়—সেলাম করে।

তাপ্পি দেওয়া শতছিন্ন গরম পোশাক প্রত্যেকের গায়ে। অনেকেরই পায়ে জুতো নেই। তবে যাদের আছে, তার জীর্ণদশা দেখে সন্দেহ হচ্ছে, কি করে ওই পাদুকা যুগল শ্রীচরণে ওরা ধারণ করে রেখেছে! তবে এরই মধ্যে দু'চারজনকে বেশ ফিটফাট দেখলাম। মুখ-চোখও তাদের বেশ সুন্দর। গায়ের রঙটা রীতিমত লালচে।

কাউকেই চিনি না জানি না। কিন্তু ওরা দেখলুম বেশ সপ্রতিভ। স্মিত হেসে হাতজোড় করে আছে। দু'চারজন তারই মধ্যে আবার জিজ্ঞেস করল—কষ্ট হয় নি তো পথে।

অদ্ভুত সরলতা এদের চোখেমুখে। কিন্তু এরা কে? কেনই বা সকলে এখানে জড়ো হয়েছে বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ তাপসদাকে ঢুকতে দেখে জিনিসটা পরিষ্কার হল। সকলেই দেখি হেসে তাপসদাকে ঘিরে দাঁড়াল। তাপসদাও সকলের কুশল নিতে লাগলেন এক এক করে।

এরা কুলী, আমাদের মালবাহক।

তাপসদা এদের আজ এখানে হাজির হবার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। তাই ওরা এখানে।

সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। অস্তাচলগামী সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু যাই যাই করেও যেতে পারে নি এখনও। সামনে হাতি পাহাড়ের মাথায় লেগে রয়েছে রক্তিম আভা।

প্রদ্যোৎদা, সুজন, নারায়ণ এবং আমি রেস্ট-হাউস থেকে বেরিয়ে উঠে আসি রাস্তায়। কয়েকজন শেরপা আর লকুলও এসেছে আমাদের সঙ্গে। তাদের সাহায্যে বাসের ছাত ও লরি থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নামিয়ে নিয়ে আসা হল রেস্ট-হাউসে। যোশী-মঠের উচ্চতা ৬১৫০ ফুট। বেশ শীত লাগছে। তাই কিটব্যাগ খুলে সদস্যদের প্রত্যেককে গরম সোয়েটার, ক্লাইম্বিং প্যাণ্ট, উলের মোজা, হাণ্টার সু ইত্যাদি কিছু কিছু জিনিসপত্র দিয়ে দেওয়া হল। আর সেই সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হল একটা করে রুকস্যাক, স্লিপিং ব্যাগ ও এয়ার ম্যাটট্রেস্। আগামী কাল আমরা আরো উপরে মালারী উঠে যাব। স্বাভাবিক কারণেই তখন আরো একটু ঠাণ্ডা বাড়বে। সুতরাং সে কথা বিবেচনা করেই এ সমস্ত জিনিস প্রত্যেককে দিয়ে দেওয়া হল।

সামনের দূর্বা ছাওয়া মাঠে কুলীরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, বিশ্বদেবদা, মদনদা, তাপসদা, আর পাসাং ফুতারকে দেখি তারা ওদের নানা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করছে। অভিযানের ডাক্তার দীপক সিনহাও বসে নেই। সে তাদের সকলকে পরীক্ষা করছে এক এক করে। তার গলায় স্টেথো। হাতে ব্লাডপ্রেসার মাপার যন্ত্র।

আমরা পোষাক-পরিচ্ছদ বিলিয়ে দিয়ে ঘরে এসে ঢুকি। দেখি ধ্রুবদা টাইপরাইটার নিয়ে নিবিষ্ট মনে টাইপ করে চলেছেন। বোধ হয় কোন সংবাদ পাঠাবেন কলকাতায়।

আমি চুপচাপ তাঁর পাশে গিয়ে বসতেই ধ্রুবদা আমার দিকে

মুখ তুলে তাকান। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলেন—একটা ডেসপ্যাচ পাডাইয়া দেই, কি কস। তা না অইলে পরশুর আগে সময় পাওন যাইব না।

ধ্রুব মজুমদার আমাদের অভিযানের সাংবাদিক। তিনি আনন্দ-বাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর জন্য পাহাড় থেকে অভিযানের রিপোর্ট পাঠাবেন। ইতিপূর্বে ধ্রুবদা নন্দাঘুন্টি এবং ১৯৬১ সালের মানা অভিযানে দলের ম্যানেজার ছিলেন। চৌষট্টিতে কাব্রুডোম অভিযানে তিনি সর্বপ্রথম বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে দলের সঙ্গে যুক্ত হন।

বেটেখাটো আকৃতির এই মানুষটি ভীষণ আমুদে প্রকৃতির। গোটা দলটাকে সর্বদা আনন্দে মাতিয়ে রাখতে তাঁর জুড়ি নেই। বিভিন্ন পর্বতাভিযান এবং হিমালয় সম্পর্কে ধ্রুবদার জ্ঞান অপরিসীম। শুনেছি, যে কোন সংকটময় মুহূর্তে সাহস এবং পরামর্শ দিয়ে অভিযানকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে দেবার অদ্ভুত শক্তি আছে তাঁর। এজন্য তিনি আমাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

ধ্রুবদা বলেন, কাইল তো আমরা মালারী যামু, তাই না রে?

—হ্যাঁ। উত্তর দিই।

—কুলীটুলি কি সঙ্গে যাইব?

—হ্যাঁ, এখানে যারা আছে তারা তো সঙ্গেই যাচ্ছে শুনেছি। এ ছাড়াও আরো কিছু কুলী আছে রিনিতে। তারাও আগামীকাল আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে।

শুনে ধ্রুবদা কি যেন ভাবলেন আপন মনে। তারপর টাইপ করতে করতে বললেন—একটা কাম কর তো। বিশ্বদেব, মদন বা তাপস যে কাউরে হয় এহানে পাঠাইয়া দে। আমার জিনিসটা একটু ভাল কইর‍্যা জানন দরকার।

কুলী নির্বাচন করতে ওরা সকলেই খুব ব্যস্ত ছিল। তা সত্ত্বেও ধ্রুবদা ডেকেছেন বলতেই তাপসদা তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন। এই অবসরে আমি শিবশঙ্করদার পাশে এসে দাঁড়াই। সেখানে সুজন ও

নারায়ণও ছিল। শিবশঙ্করদা আমাকে দেখেই বলেন—চল্, একটু ঘুরে আসি আমরা।

সত্যি কথা বলতে কি, এখন এই মুহূর্তে আমাদের কোন কাজ নেই, তাই আমরা চারজনে বেরিয়ে পড়ি বাইরে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে আসি রাস্তায়।

বছর চারেক আগে নীলগিরি পর্বতাভিযানের সময় আমি যে যোশীমঠকে দেখেছিলাম, তার সঙ্গে আজকের যোশীমঠের বিরাট পার্থক্য। রাস্তাগুলো আরো চওড়া হয়েছে। দ্বিগুণ হয়েছে দোকান-পাটের সংখ্যা। আগে নিচের রাস্তা শহরের প্রধান আকর্ষণ ছিল, এখন তা আর নয়। দোকানপাট হাট-বাজার হোটেল-বার ইত্যাদি সবকিছু এখন উঠে এসেছে ওপরের রাস্তার দু'পাশে। বিজলী আলোয় ঝলমল করছে যোশীমঠ। শুনলাম স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, তার-ঘর ইত্যাদি মানুষের প্রয়োজনীয় সবকিছুই আজ যোশীমঠে রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, যে যোশীমঠে মাছ-মাংস-ডিম ইত্যাদি নিষিদ্ধ ছিল, আজ তা প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে। দোকানে, হোটেল-রেস্তোরাঁতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ভীড়।

ভাবতে বড় অবাক লাগে। কে বলবে এই সেই তপশ্চারণ ভূমি? এখানেই ভগবান শঙ্করাচার্য জ্যোতির্মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে হিন্দুধর্ম যখন অবলুপ্ত হতে চলেছিল, তখন শঙ্করাচার্য হিন্দুধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আজকের এই পাইন আর দেওদারে ঘেরা যোশীমঠেই জ্যোতির্মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

শোনা যায় মহর্ষি বেদব্যাস শঙ্করাচার্যকে জ্যোতির্মঠে দর্শন দান করেছিলেন। তাঁরই আদেশে হিন্দুধর্মকে ক্রমাবনতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শঙ্করাচার্য ভারতবর্ষের চারিদিকে চারটি মঠ স্থাপন করেন। এদের মধ্যে ভারতের উত্তরে এই জ্যোতির্মঠই আদি এবং প্রধান। বাকি তিনটি—দক্ষিণে রামেশ্বর সেতুবন্ধে শৃঙ্গেরীমঠ, পূর্বে পুরুষোত্তম তীর্থে গোবর্ধন মঠ ও পশ্চিমে দ্বারকার শারদা মঠ।

চায়ের দোকানে বসে স্থানীয় লোকের মুখে জানতে পারলাম তপোবন ও রিনির মাঝে কোন এক জায়গায় বিরাট ধস্ নেমেছিল ক'দিন আগে। ডাইরেক্টার জেনারেল অব বরডার রোডসের লোকেরা গতকাল অবধি তা পরিষ্কার করে উঠতে পারে নি। যদি আজকের মধ্যে তা পরিষ্কার হয়ে গিয়ে থাকে তবেই কাল গাড়ি ওপরে যেতে পারবে, নইলে নয়।

মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। মূল অভিযান শুরু হবার আগেই যদি এ ধরনের বাধা আসে, তা হলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হবে। সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দেবে কুলীদের নিয়ে। বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দিতে হবে তাদের। তা ছাড়া অতগুলো লোকের খাওয়া-থাকা ইত্যাদি নিয়েও বিস্তর ঝামেলা। জলের মত পয়সা খরচ করেও কোন কূল-কিনারা পাওয়া যাবে না। অথচ প্ল্যান-প্রোগ্রাম অনুযায়ী সবকিছু ঠিকভাবে চললে এ ধরনের অর্থদণ্ড দিতে হয় না। জানি না, আমাদের ভাগ্যে কি লেখা আছে।

পরদিন। যোশীমঠ থেকে তপোবন মাত্র ছ' মাইল। চড়াই ভেঙে হু হু শব্দে আমাদের বাস ছুটে চলেছে তপোবনের দিকে। পথের দু' পাশে পাহাড়ের ধাপে ধাপে ক্ষেত। দূরে অনেক নিচে সরু শাদা একচিলতে আঁকা-বাঁকা ফিতের মত ধৌলিগঙ্গা। দূর থেকে তাকে নিথর নিস্তব্ধ দেখাচ্ছিল। কিন্তু কাছে আসতেই তার অন্যরূপ দেখলাম, প্রবল গর্জনে দুর্বার বেগে বয়ে চলেছে নিচে। বিষ্ণুপ্রয়াগে গিয়ে মিশেছে অলকানন্দার সঙ্গে।

তপোবনের সীমায় বাস ঢুকতেই চেকপোস্ট থেকে একজন পুলিশ বেরিয়ে এল। বোধ করি সে পারমিট দেখতে এসেছিল। কিন্তু তা দেখবার আগেই সে তাপসদাকে দেখতে পেয়ে একটা লম্বা স্যালুট লাগাল। এগিয়ে এল কাছে।

তাপসদা কোন কথা না বলে ব্যাগ থেকে উত্তর প্রদেশ সরকারের দেওয়া অনুমতিপত্রখানি বের করে পুলিশটির হাতে দেন।

কয়েকটি মুহূর্ত। অনুমতি পত্রখানির উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই সে জানাল, একটা বিরাট ধস্ নেমে তপোবন ও রিনির সংযোগ রক্ষাকারী মাইলখানেক আগের পুলটি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

—সে কি? আমরা আঁতকে উঠি।

সে বলে চলে—বহু চেষ্টা করেও সে পুল মেরামত করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

—তা অইলে এ্যাহন উপায়? ধ্রুবদা জানালা দিয়ে মুখ বাড়ান।

—ওপারে যাওয়ার কি কোন উপায় নেই? তাপসদা গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করেন পুলিশটিকে।

—না।

—লোকজন যাতায়াত করছে কি করে?

—একটা অস্থায়ী কাঠের সাঁকো করে দিয়েছে।

আমরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ি। এই যে লরি আর বাস বোঝাই মালপত্র, এর কি হবে! কী করে যে এগুলো নিয়ে যাওয়া সম্ভব তা আমরা ভেবে কোন কূলকিনারা করতে পারি না। আবার মনে পড়ল, ১৯৬১ সালের মানা অভিযানের কথা। সেবারেও ধস্ নেমে রাস্তা অবরুদ্ধ হওয়ায় অশেষ দুর্গতি পোয়াতে হয়েছিল অভিযাত্রীদের। তা হলে কি এবারেও আমাদের সেই দুর্ভোগ ভোগ করতে হবে? হাঁটতে হবে এই তপোবন থেকেই?

তাপসদা কিন্তু অত সহজে দমবার পাত্র নন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি খোঁজখবর নিয়ে ফিরে এলেন। আমরা অত্যন্ত দুশ্চিন্তার মধ্যে অপেক্ষা করছিলাম। তাপসদাকে দেখতে পেয়েই তাকে ঘিরে ধরি। তিনি বলেন, পি. ডবলিউ. ডি.র দু'খানা লরি পাওয়া গেছে। ঘণ্টা দু'-তিন পরে ওপারে আসবে। আমাদের এখন কাজ হল সমস্ত মালপত্র ওপারে বয়ে নিয়ে যাওয়া।

—তা হলে আজ মালারী পৌঁছুন সম্ভব হচ্ছে না? প্রদ্যোৎদা প্রশ্ন করেন।

—না। আজকে আপাততঃ আমরা রিনি যাচ্ছি।

তবু এই ব্যবস্থা মন্দের ভাল বলতে হবে। মাঝ রাস্তাতে অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়ে থাকার চেয়ে অনেক ভাল।

ধ্রুবদা এতক্ষণ চুপচাপ সব শুনছিলেন। এই বিপদের মুখেও আমরা যে একেবারে পথে বসে যাই নি, তার জন্য তিনি তাপসদাকে ধন্যবাদ জানালেন। তাঁর কাজের তারিফ করে তিনি বলেন—তরে আইজ আমি কর্নেল পদে প্রমোশান দিয়া দিলাম। তুই মিলিটারী-গো মতই কাজ করছস।

শুনে সকলেই অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ে। তারপরেই শুরু হয় মালপত্র ফেরী করার পালা। মালপত্র বোঝাই ট্রাক আর বাস ছুটো সাঁকো পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল। বাস থেকে নামতেই নজরে পড়ল ধসের সামগ্রিক চেহারাটা। এমন ধ্বংসলীলা আমি ইতিপূর্বে আর কখনও দেখি নি। তপোবনে চেকপোস্টের পুলিশের মুখে এই ধসের কথা শুনেছিলাম ঠিকই, কিন্তু তা যে এত ভয়াবহ হতে পারে, তা কল্পনাও করতে পারি নি। কী বীভৎস ভয়ঙ্কর এর রূপ! এই বিপর্যয় রাতে ঘটেছিল বলেই রক্ষে। কেউ হতাহত হয় নি।

সামনের প্রায় গোটা গিরিপ্রাচীরটাই ঝরনা থেকে সৃষ্ট নদীটার ওপরে ভেঙে পড়েছে। ঝরনাধারার গতিপথ স্তব্ধ হয়ে গেছে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কাঠের পুলটি। তার ছিটেফোঁটা অংশও আর অবশিষ্ট নেই। পরিবর্তে সেখানে ভেঙে-পড়া পাথর আর মাটিতে একটি উঁচু বাঁধের সৃষ্টি হয়েছে। এই বাঁধের ওপারে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে টইটুম্বর জল থৈ থৈ করছে। রীতিমত একটা প্রকাণ্ড হ্রদ। তার উপরে আবার পাহাড়ের গা থেকে বিপুল বেগে তর্জন গর্জন করে জল নামছে। ফলে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে হ্রদের জল বেড়ে চলেছে। দেখা দিয়েছে এক নতুন বিপদের আশঙ্কা। ক্রমাগত এভাবে

জল বাড়তে থাকলে আশেপাশের গ্রামগুলি জলমগ্ন হয়ে যাবে। ক্ষেত-খামার, ঘর-বাড়ি কিছুই রক্ষা করা যাবে না।

অনেক লোক কাজ করছে। তারা সকলে মিলে বিরাট বিরাট পাথরগুলি সরিয়ে হ্রদের জমে যাওয়া জল নিচে গৌরীগঙ্গায় বইয়ে দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

উল্টো দিকের পাহাড়ের গা বেয়ে আর একটি ঝরনা নিচে নেমে গেছে এই নদীতে। পাথরে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সেই জলরাশি প্রচণ্ড আস্ফালন করে গৌরীগঙ্গায় গিয়ে মিশেছে। এরই উপর দিয়ে দুটো অপ্রশস্ত কাঠের লগ ফেলে একটি অস্থায়ী সাঁকো তৈরি করা হয়েছে। এরই উপর দিয়ে সমস্ত মালপত্র নিয়ে আমাদের ওপারে যেতে হবে। এ ছাড়া রিনিতে যাওয়ার আর দ্বিতীয় পথ নেই।

প্রভূত পরিশ্রমের পরে আমরা শেরপা ও নকুলদের সঙ্গে মিলে ছ'টন মাল পুল পার করে ওপারে রাস্তার ধারে এনে জড়ো করলাম। সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা!

এখনও ট্রাক আসতে দেরি আছে। এই অবসরে তপোবনকে একটু ভাল করে দেখে নেওয়া যাক। আমরা সকলে পথে বেরিয়ে পড়ি।

তপোবনের অনতিদূরেই তপ্তকুণ্ড। প্রকৃতির আপন খেয়ালেই এই কুণ্ডের জল গরম। স্নান করার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। গ্রামের প্রায় সব মানুষই এই কুণ্ডের জলে স্নান করে, কাপড়-চোপড় কাচাকাচি করে। আমরাও ঠিক করলাম এখানে স্নান করব। কারণ একবার যখন সুযোগ পাওয়া গেছে, তখন স্নানের এমন সুযোগ হাত ছাড়া করা উচিত হবে না। উপরে প্রবল ঠাণ্ডায় আমরা আর স্নান করবার সুযোগ পাব না। বেশ কিছু দিন আমাদের বিনা স্নানেই কাটাতে হবে।

তপ্তকুণ্ডের ধারেই পার্বতী দেবীর মন্দির। বেশ ছিমছাম আর ঝকঝকে পরিবেশ। গোটা কুণ্ডটাই শান বাঁধানো। উপরে পাহাড়ের

গা বেয়ে নেমে এসেছে একটি ক্ষীণধারা—উষ্ণ জলের। সেই জল ক্রমাগত জমা হচ্ছে এই কুণ্ডের মধ্যে। আর নোংরা জল চলে যাবার জন্য রয়েছে একটি নালা, পাশের ক্ষেতখামারে গিয়ে পড়েছে।

মুনি-ঋষিদের পদধূলিতে ধন্য তপোবন। তপোবন ধন্য পর্বতারোহীদের সমাগমে। মিড্, রাটলেজ, স্টাফ, টিলম্যান, স্মাইথ প্রভৃতি বিখ্যাত পর্বতারোহীরা সবাই এই তপোবনে এসেছেন। এখানকার ধ্যানগম্ভীর সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়েছেন। আজকের মত তখন হৃষিকেশ বা হরিদ্বার থেকে বাস চলাচল করত না। ছিল না এমন চওড়া পাহাড়ী রাস্তা। গাড়োয়ালি হিমালয়ের এই অংশে কোন পর্বতাভিযান করতে হলে তখন অভিযাত্রীরা রানীক্ষেত আলমোড়া থেকে সরাসরি হেঁটে আসতেন। ওয়ান, কনোল, রামনি ইত্যাদি হয়ে কুয়ারী গিরিবর্ত্ম (১২,৪০০ ফুট) অতিক্রম করে তাঁরা আসতেন ধৌলি বিধৌত তপোবনে। প্রায় একশ মাইল পথ পাড়ি দিতে হত দশ-বারো দিনে। কুয়ারী গিরিবর্ত্ম থেকে বিস্তৃত তুষার মৌলি পর্বতমালার নয়নাভিরাম দৃশ্য অতুলনীয়। ত্রিশূল (২৩,৩৬০ ফুট) কেদারনাথ (২২,৭৭০ ফুট), কামেট পর্বতমালা (২৫,৪৪৭ ফুট) দুনাগিরি (২৩,১৮৪ ফুট), নীলকণ্ঠ (২১,৬৪০ ফুট) ইত্যাদি পর্বতশৃঙ্গগুলির তুলনা বিরল।

পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে নামছিলাম ধীরে ধীরে। হঠাৎ নজরে পড়ল একটি ছোট্ট ঘর। শ্লেট পাথরের ছাউনি। কাছে আসতেই দেখতে পেলাম ছেলেমেয়েরা চিৎকার করে নামতা মুখস্থ করছে। আর মাস্টারমশাই ঘরের বাইরে রোদে পিঠ দিয়ে বেত হাতে বসে আছেন। আমাকে দেখেই ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল হঠাৎ চুপ করে গেল। হয়তো ভিনদেশী একজন মানুষকে দেখতে পেয়ে তাদের বড় কৌতূহল হয়ে থাকবে! মাস্টারমশাই আমাকে ডেকে নিয়ে সামনে বসাতেই হাত জোড় করে ছেলেমেয়েরা বলে উঠল—নমস্তে জী। তাদের এই সৌজন্যবোধে মুগ্ধ হলাম।

কথায় কথায় মাস্টারমশাই জানালেন—ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এ অঞ্চলে মন্দ নয়। অভাব শিক্ষকের। শিক্ষিত মানুষরা পড়ে থাকতে চান না এই গহন-গিরি-কন্দরে। পাহাড়ী মানুষেরা আজকাল লেখাপড়ার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। কেউ আর আগের মত নিজ নিজ ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে ইতস্ততঃ করেন না।

মাস্টারমশাইর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্কুলঘর থেকে বেরিয়ে আসি রাস্তায়। সত্যিই তপোবনের তুলনা হয় না, ছবির মত সাজানো সুন্দর সবুজ উপত্যকা। চারিদিকে আপেলের ছড়াছড়ি। যেদিকে তাকাই মন এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে ওঠে।

সন্ধ্যার আগেই আমরা রিনিতে পৌঁছুলাম। ঋষিগঙ্গা ও ধৌলি-গঙ্গার সঙ্গমে পাহাড়ে ঘেরা রিনি একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। উচ্চতা ৬০০০ ফুট। খবর পাওয়া গেল এখান থেকে প্রায় মাইল চারেক দূরে লতা-গ্রামের নিচে আরো একটা বিরাট ধস নেমেছে, ফলে গাড়ি চলাচল বন্ধ। বর্ডার রোডস-এর লোকেরা ক'দিন ধরে উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও রাস্তা পরিষ্কার করে উঠতে পারে নি। এ দুঃসংবাদে আমরা উদ্বিগ্ন হলাম।

ছোট্ট গ্রাম রিনি। কাজেই এখান থেকে কিছুতেই আমাদের প্রয়োজনীয় কুলী সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। অবশ্য স্থানীয় ঠিকাদার কেদার সিং আশ্বাস দিল সে তার সাধ্যমত চেষ্টা করবে।

পরের দিন কেদার সিং কয়েকজন লোক ধরে নিয়ে এল। এ ছাড়া আমাদের সঙ্গে যে ক'জন কুলী ছিল তাদের এবং শেরপা ও লকুলদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রিনি থেকে মাল তোলা সম্ভব হল। সদস্যদেরও সঙ্গে মদৎ দিতে হল। বার কয়েক ফেরীর সাহায্যে সমস্ত মালপত্র ধস্ পার করে লতার কাছে নিয়ে আসা হল। সেখানে তাপসদা পি. ডবলিউ. ডি.র দু'খানা লরি যোগাড় করে রেখে

দিয়েছিলেন। আমরা তাতেই কিছু কিছু মালপত্র উঠিয়ে ভাবকুণ্ডে পৌঁছলাম। বিশ্বদেবদা লরি থেকে নেমেই একজন আর্মি অফিসারের কাছে আমাদের বর্তমান সঙ্কটময় পরিস্থিতির কথা বুঝিয়ে বলতে গেলেন। এখনও আমাদের বেশ কিছু মালপত্র লতাতে পড়ে রয়েছে। গাড়ির অভাবে সেগুলি নিয়ে আসা সম্ভব হয় নি।

শুনে মেজর সাহেব আশ্বাস দিলেন তিনি গাড়ির ব্যবস্থা করে দেবেন নিশ্চয়ই। তবে এই মুহূর্তে এখানকার পরিস্থিতি কী, গাড়ি আছে কি নেই, না জেনে কিছু বলতে পারছেন না। তবে তিনি তৎক্ষণাৎ লোক পাঠিয়ে খোঁজখবর আনতে পাঠালেন।

কিছুক্ষণ পরে খবর এল গাড়ি আছে। মেজর সাহেব সহাস্যে বললেন—আপনাদের বরাত ভাল বলতে হবে। আমি বলে দিচ্ছি, আপনারা যে কেউ সঙ্গে গিয়ে মালপত্র উঠিয়ে সন্ধ্যের আগেই এখানে ফিরে আসুন!

ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা ফিরে এলাম। এসে দেখি আমাদের কুলী এবং ঘোড়াওয়ালারা ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছে। রাস্তা খারাপ থাকায় তারা আজ মালারীতে যেতে পারে নি। তাই তারা দল বেঁধে ভাবকুণ্ডে আশ্রয় নিয়েছে।

এ যেন শাপে বর হল। কুলীর জন্য আমরা হা-পিত্যেশ করছিলাম! এখন আর কোন চিন্তা নেই। এবারে পায়ে চলার উপযোগী রাস্তা পেলে আমাদের এগিয়ে যেতে আর কোন বাধা নেই। সব সময় 'কি হবে' 'কি হবে' বলে যে উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকতে হত, এখন আর তা থাকতে হবে না।

এদিকে লতা থেকেও সন্ধ্যের আগেই বাকি সমস্ত মালপত্র এবং কয়েকজন লকুল এসে পৌঁছুল। সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আগামীকাল থেকে আর কারুর উপর নির্ভর করে চলতে হবে না। কুলী, মালবাহী ঘোড়া, খচ্চর ইত্যাদি সবকিছুই যখন এখানে পাওয়া গেছে, তখন আর ভাববার কিছু নেই।

জায়গা হিসাবে ভাবকুণ্ড খুবই ছোট। চারিদিকে কেবল পাহাড় আর পাহাড়ের প্রাচীর। কিন্তু বড়ই অদ্ভুত এই সমস্ত পাহাড়ের গঠন বৈচিত্র্য। মাটি আর পাথরের সংমিশ্রনে তৈরি এই পাহাড়-গুলোকে দূর থেকে অনেকটা উই-এর ঢিবির মত দেখায়, স্থানীয় লোক এ ধরনের পাহাড়কে বলে গিলা পাহাড়।

সর্বদাই হাওয়া বইছে এখানে। বেশ শুকনো হাওয়া। হাত মুখে টান ধরে। সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার হাওয়ার দাপটে সর্বক্ষণই এই সব পাহাড়ের গা-মাথা থেকে অবিশ্রান্ত ধুলো উড়ছে। গোটা অঞ্চলটাই ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

বেশ শীত এখানে। নিচে থেকে উঠে আসার দরুন তা যেন আরো বেশি করে পেয়ে বসেছে আমাদের। চা-টা খেয়ে খানিকটা বিশ্রাম নিই। তারপরেই শুরু হয় মালপত্র গোছগাছ করার পালা। স্তূপীকৃত মালপত্র চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। তাই সেগুলোকে প্রথমে সব এক জায়গায় জড়ো করে নেওয়া হল। তারপর অপেক্ষাকৃত একটা সমতল জায়গায় প্যাকিং বাক্স, চাল, ডাল, আটা ইত্যাদির বস্তা পর পর সাজিয়ে তিন দিক ঘিরে নেওয়া হল উঁচু করে। এ্যালুমিনিয়ামের মইগুলো মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ঘরের খুঁটি করা হল। আর তার ওপরে দেওয়া হল ত্রিপলের ছাউনি। উন্মুক্ত আকাশের নিচে রাত্রিযাপনের চেয়ে এই ধরনেব সাময়িক আস্তানা অনেক ভাল।

হাওয়ার দাপট ক্রমশঃই যেন বাড়ছে। আমি সামনের পাহাড়ের মাথার দিকে তাকাই। এক্ষুণি হয়তো পাহাড়ের গা-মাথা থেকে ধুলো উড়বে। গড়িয়ে পড়বে ছোট্ট ছোট্ট নুড়ির মত পাথর। একটানা এগুলো গড়িয়ে পড়ার পরে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের পাথরের টুকরো খসে পড়বে। তারপর খানিকক্ষণ পরে আরো একটু বড়গুলো, এইভাবে ক্রমান্বয়ে পড়তে পড়তে দেখা যাবে হঠাৎ গোটা পাহাড়টাই বিকট শব্দ করে ভেঙে পড়ল। কিছুই বিচিত্র নেই এখানে। গিলা পাহাড় বড় মারাত্মক।

স্থানীয় লোকেরা বড় হুঁশিয়ার এ বিষয়ে। একটু দমকা হাওয়া চললেই ওরা আড় চোখে পাশে দেখে নেয়। পাহাড়ের গা থেকে ধুলো উড়ছে দেখতে পেলে আর কোন কথা নেই। ধারে কাছে ত্রিসীমানায় আর তখন কেউ থাকবে না। ছুটে পালিয়ে যাবে নিরাপদ দূরত্বে।

আমাদের অবশ্য ভয়ের কোন কারণ নেই। ধস্ যদি নামে তো, আমাদের কোন ক্ষতি হবে না। বেশ খানিকটা দূরে নিরাপদ স্থানেই আমাদের ছাউনি ফেলা হয়েছে।

পাশেই ছোটখাটো একটা কিচেনও তৈরি করা হয়েছে। শিব-শঙ্করদা দেখছি রান্নার যোগাড়ে ব্যস্ত। তার এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে একটা ছোট্ট খাতা। বোধ করি স্টোরলিস্ট। অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে প্রত্যেকটি প্যাকিং বাক্স ও বস্তার উপর আলো ফেলে ফেলে দেখছেন। পেছনে তাঁর অন্যতম সহচর সুজন এবং ছুপ্পে।

—কি খুঁজছেন শিবশঙ্করদা? আমি এ পাশ থেকে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করি।

—হলুদ-লঙ্কার বাক্সটা কোথায় আছে বলতে পারিস?

—কত নম্বর বাক্স?

—একচল্লিশ, সুজন ওপাশ থেকে চিৎকার করে ওঠে।

—বলতে পারলুম না দুঃখিত।

—দুঃখিত হবার কিছু নেই। হলুদ-লঙ্কা বিহীন ডাল পাতে দিলে কিন্তু দুঃখ কোর না। শিবশঙ্করদা গম্ভীরভাবে বলেন।

—না দুঃখ কোরব না।

—এই তো শালা একচল্লিশ নম্বর বাক্স এখানে! তোর চোখটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে শিবু। সুজন হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে।

—তোরটা এখনও ভাল আছে জেনে খুশি হলাম। নে, টর্চটা ধর দেখি। বাক্সটা নামাই আগে। ডাল বোধ হয় শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

অদ্ভুত মজার মানুষ শিবশঙ্করদা। হিউমার করতে তিনি অদ্বিতীয়। পর্বতাভিযানে একেবারে নবাগত। পাহাড়ে ওঠার ট্রেনিং তো দূরের কথা, সামান্যতম অভিজ্ঞতাও নেই শিবশঙ্করদার। থাকার মধ্যে তাঁর কেবল আছে সুন্দর সুঠাম স্বাস্থ্যটুকু। লম্বায় প্রায় ছ'ফুট। অসাধারণ শক্তি তাঁর গায়ে। আর আছে প্রবল মনের জোর। পাহাড়-পর্বতে যার প্রয়োজন সর্বাধিক।

সাংগঠনিক কাজেও শিবশঙ্করদার অসামান্য দক্ষতা। অভিযানে রওনা হবার আগে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তিনি সেই নৈপুণ্য দেখিয়ে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছেন। পরোপকারী বলে বন্ধুমহলে তাঁর বেশ সুনাম আছে। তবে দোষের মধ্যে একটা জিনিস নিয়ে কখনই লেগে থাকতে পারেন না। আর থাকতেও চান না তিনি। আদতে তিনি একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। এখানে আসবার আগে কাজ করছিলেন একটা দেশী ফার্মে। কিন্তু এই অভিযানে আসার জন্য তিনি সেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এসেছেন। আসলে শিবশঙ্কর ব্যানার্জির নেশা এবং পেশা কী তা বোধ হয় তিনি নিজেও নির্ভুলভাবে বলতে পারবেন না।

২৫শে আগস্ট, সকাল থেকেই শিবিরে সাজ সাজ রব। কুলীরা সাত সকালে উঠে কাঠের আগুন জ্বালিয়ে রুটি তৈরি করছে। ঘোড়া আর খচ্চরওয়ালারাও চুপচাপ বসে নেই। তারাও একটা প্রকাণ্ড পাথরের আড়ালে প্রাতঃরাশ তৈরি করতে ব্যস্ত।

নির্মেঘ, নীলাকাশ। চকৎকার আবহাওয়া। দূরে পাহাড়ের মাথায় রক্তিম আভা। বিশ্বদেবদা, নিমাইদা, তাপসদা ও পাসাং ফুতার অন্যান্য শেরপাদের নিয়ে মালপত্রগুলো লাইনবন্দী করে সাজিয়ে রাখছেন। ওজন করে করে এর এক একটি বোঝা প্রত্যেককে ভাগ করে দেওয়া হবে আর একটু পরেই। সুজন, নারায়ণ খাতা-

পেন্সিল নিয়ে রেডি। ওরা কুলীদের নামধাম, নম্বর ইত্যাদি লিখে ছেড়ে দেবে।

কিচেনে শিবশঙ্করদাও মহাব্যস্ত। সদস্য আর শেরপাদের যত তাড়াতাড়ি প্রাতঃরাশ তৈরি করিয়ে খেতে দিতে পারবেন, তত তাড়াতাড়ি সকলে এখান থেকে রওনা হতে পারবে।

ধ্রুবদাও চুপচাপ বসে নেই। একটা পাথরের উপর বসেছেন। সামনে কালো ট্রাঙ্কের উপর টাইপরাইটার। মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে কি যেন টাইপ করে চলেছেন।

আর দিলীপদা? এখনও সূর্যের আলো এসে পৌঁছয় নি। কিন্তু দিলীপদা ক্যামেরা ঘাড়ে করে উপর-নীচ করছেন। ফলে বেচারী পাসাংও একজায়গায় সুস্থিত হয়ে বসতে পারছে না। সে-ও ক্যামেরার স্ট্যাণ্ড নিয়ে দিলীপদার পিছু পিছু ওঠা-নামা করছে।

ডাক্তার দীপক ওষুধের বাক্স খুলে কী যেন খুঁজছে। তার সামনে কয়েকজন কুলী বসে আছে। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে বাক্সের দিকে।

এদিকে মালপত্র বণ্টন শুরু হয়েছে। কুলীরা চারদিকে দাঁড়িয়েছে। তাপসদা সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন। বিশ্বদেবদা ও নিমাইদা তাঁকে সাহায্য করছেন। আজকের গন্তব্যস্থল মালারী। ওঁরা বলছেন—প্রতিটি জিনিস যেন তারা নিজেদের মনে করে, না ভেঙেচুরে সাবধানে পৌঁছে দেয়। যদি কোন অসুবিধা হয়, তা হলে তারা যেন বিন্দুমাত্র লজ্জা না করে তৎক্ষণাৎ আমাদের জানায়, আমরা সাধ্যমত সে অসুবিধা দূর করবার চেষ্টা করব।

হঠাৎ একটা প্রবল গুঞ্জন উঠল। কুলীরা ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কি যেন বলাবলি করছে।

একটু বাদে মদনদা ছুটতে ছুটতে এলেন। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলতে শুরু করলেন—ভাই সব…

কুলীরা তাঁর দিকে তাকালো। মদনদা বলতে লাগলেন—আমি

বুঝেছি, তোমাদের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা কি হবে তাই তোমরা জানতে চাইছ। যেখানে পয়সা ফেললেও খাবার পাওয়া যায় না সেখানে তোমরা কি করবে? এই না? তাপস সাব, বিশ্বাস সাব তোমাদের আগেই এসম্পর্কে সবকিছু বলে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও আমি তোমাদের আবার পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছি সব। তোমরা ধৈর্য ধরে মন দিয়ে আমার কথা শোন।

মদনদার এই কথা শুনে কুলীদের সকলের মুখে হাসি ফুটে উঠল। তারা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে পুনরায় ঘুরে দাঁড়াল মদনদার দিকে।

মদনদা সবাইকে বসতে বলার ইঙ্গিত করলেন। তারপর তিনি একটু পিছিয়ে এসে একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন—বন্ধুগণ, আমরা সুদূর বাংলাদেশ থেকে এখানে এসেছি তোমাদের হিমালয়ের দেশে পাহাড়ে আরোহণ করতে। পাহাড়ে আরোহণ করা কি যে কষ্টসাধ্য ব্যাপার তা নিশ্চয় তোমাদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। তোমরা সকলেই এখানকার মানুষ, তোমরা আমাদের চেয়ে তা ভালই জান। অতএব সে সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই না। আমি যেটা বলতে চাই তা হল, এখানে প্রতি পদক্ষেপেই রয়েছে মৃত্যুর সম্ভাবনা। মৃত্যুর উপরে যদিও মানুষের কোন হাত নেই, তা হলেও বলব, অনেক সময় পর্বতাভিযানে সামান্য খাবার এবং ওষুধের অভাবেও লোক মারা যায়। আমাদের সঙ্গে রয়েছে প্রচুর খাবার এবং ওষুধপত্র। রয়েছেন একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার। অতএব আমরা যদি সকলে একটু হুঁশিয়ার হয়ে অভিযানের সমস্ত রসদ, ওষুধ, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি নিয়ে ঠিক ঠিক ভাবে চলতে পারি, তা হলে আমার মনে হয় আমরা কেউ-ই কোন অসুবিধায় পড়ব না। নির্বিঘ্নে পাহাড় থেকে ঘরে ফিরে আসতে পারব। ভুলে যেও না বন্ধুগণ, তোমরা আমাদের মেহমান। তোমাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব আছে, আছে কর্তব্য। আমরা যতক্ষণ বেঁচে

থাকব, ততক্ষণ দেখব যাতে তোমাদের কারো কোন অসুবিধা না হয়।

পর্বতাভিযানে মূল শিবিরে না পৌঁছনো পর্যন্ত কুলীদের মধ্যে প্রতিদিন মালপত্র বণ্টন করা, হিসেব-নিকেশ রাখা এবং নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়া ইত্যাদির তদারক করা রীতিমত কষ্টকর কাজ। এ ব্যাপারে কুলীদের মনরক্ষা করাই সবচেয়ে কঠিন। আর তা না করতে পারলেই গণ্ডগোলের সম্ভাবনা। সুতরাং এ কাজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন। তা না হলে কুলীদের অসহযোগিতার ফলে অভিযান বানচাল হওয়াও বিচিত্র নয়। দেখলাম, এ ব্যাপারে মদনদা সত্যিই একজন যোগ্য ব্যক্তি। আগেই অবশ্য তাঁর কথা শুনেছিলাম। কুলীদের ম্যানেজ করতে মদনদা অদ্বিতীয়ই নয় শুধু, তাদের মনের গোপন খবরাখবর সম্পর্কেও তিনি বেশ ওয়াকিবহাল। চোস্ত হিন্দিতে মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দিয়ে তিনি কুলীদের মন জয় করে নিচ্ছেন।

ধীর-স্থির এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী মদন মণ্ডল একজন দক্ষ পর্বতারোহী। নন্দাঘুন্টি দিয়ে তার পর্বতারোহণের সূত্রপাত। এর পরে আজ পর্যন্ত তিনি মোট তিনটি অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি সিকিম হিমালয়ের কাব্রুডোম-এ আরোহণ করেছেন।

কিন্তু গোড়ায় প্রত্যেকবারই মদনদা কুলী সামলানোর দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন। অথচ কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন না। বুঝতেই পারেন না কেমন করে তিনি নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। এবারেও তা-ই হল।

মদনদা তাঁর বক্তৃতা শেষ করেছেন—অতএব বন্ধুগণ, আজ থেকে আমরা সকলে এককাঠ্‌ঠা হয়ে চলব। সবাই সবাইকে দেখব। কারণ আমরা সবাই একই পরিবারের লোক। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সুখ-দুঃখের অংশীদার ইত্যাদি।

কুলীরা খুব খুশি। কারণ কোন সাহেবকে এমন আপনজনের

মত কথা বলতে তারা এই প্রথম শুনল। মদনদা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাই তারা তাঁকে ঘিরে ধরল। মদনদার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কেউ বা একগাল হেসে অথবা হাতজোড় করে বলল—ঠিক বাতায়া সাব। হামলোগ সব এক হ্যায়।

কুলীরা আবার যে যার মালপত্র পিঠে তুলে নিল। ঘোড়া আর খচ্চরওয়ালারাও ঘোড়া-খচ্চরের পিঠে বেঁধে দিল বোঝা।

সত্যিকারের অভিযানের এই হল শুরু। প্রথমে চুয়ান্নজন কুলী লাইন দিয়ে এগিয়ে চলল। তাদের সামনে-পেছনে, কিংবা মাঝখানে আমাদের বারোজন লকুল। নিজেদের জিনিষপত্র ছাড়াও তারা কিছু কিছু মাল তুলেছে পিঠে।

ঠিক এরই পিছন পিছন চলতে শুরু করল চুয়ান্নটি ঘোড়া আর খচ্চর। সারি বেঁধে গলার ঘণ্টার ঢং ঢং আওয়াজ তুলে ধীর-স্থির পদক্ষেপে চলতে শুরু করল। আর চলতে লাগল বারোটি চমরীগাই।

আমরা বারো জন সদস্য, আর আট জন শেরপা সবার পেছনে। যখন ভাবকুণ্ড থেকে রওনা হলাম তখন দশটা বেজে গেছে। পাহাড়ের পাঁচিল টপকে মিষ্টি রোদ ভাবকুণ্ডে উপচে পড়ছে।

ভাবকুণ্ডের উত্তর-পূর্বে মালারী (১০,০১৪ ফুট)। এখান থেকে মাইল চারেকের পথ। সমস্ত পথটুকুই ছায়াঘন পাইন-দেওদারে ঘেরা। প্রথম পর্বে খানিকটা চড়াই ভাঙতে হলেও পথ মোটামুটি বেশ ভালই। দু'একটা জায়গায় অবশ্য ধস্ নেমে বিপজ্জনক আকার ধারণ করেছে। তবে বডার রোর্ডস-এর লোকেরা ডিনামাইট চার্জ করে রাস্তার পাথর সরাতে বদ্ধপরিকর।

পথ চলতে চলতে মদনদা কখনও এগিয়ে গেলেন সামনে, আবার কখনও বা পিছিয়ে এলেন। উদ্দেশ্য, প্রত্যেক মালবাহক, প্রতিটি পশু ঠিকমত মালপত্র নিয়ে এগুচ্ছে কিনা।

গান গাইতে গাইতে, গল্প করতে করতে আমরা ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যেই মালারী পৌঁছলাম। আর বেলা একটার মধ্যে পৌঁছে গেল

অধিকাংশ মালবাহক ঘোড়া, খচ্চর আর চমরীগাই মোট কথা প্রথম দিন হিসেবে সব কাজ ভালোয় ভালোয় শেষ হল বলা চলে।

ধৌলীগঙ্গার তীরে পাহাড়ে ঘেরা মালারী। ছবির মত সুন্দর একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। চাষ-আবাদই এখানকার মানুষের প্রধান জীবিকা। তবে আজকাল গ্রামের মানুষ ক্ষেত খামার ছেড়ে চাকরির দিকে বেশি মনোযোগ দিয়েছে। অনেকেই এখন পল্টনে কিম্বা রাস্তা তৈরির কাজে যোগ দিচ্ছে। ফসল ফলানোর জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়। দিনকাল পাল্টেছে, সেজন্য প্রয়োজনও বেড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। বাঁধাধরা আয় না থাকলে শুধু চাষের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা বেশ কঠিন। কাজে কাজেই বাঁচার তাগিদেই আজ প্রত্যেক পরিবারের কেউ না কেউ চাকরি করতে বাধ্য হচ্ছে।

আমাদের তাঁবু পড়েছে মালারীগাড়ের তীরে। ছোট-বড় পাথরে আকীর্ণ স্থানটিতে রাত্রিবাস দুষ্কর, তাহলেও এ ছাড়া আর অন্য কোন উপায় ছিল না। উত্তরপ্রদেশ সরকার অবশ্য ইন্স্পেকসন বাংলোটি আমাদের জন্য রিজার্ভ করে রেখেছিলেন। কিন্তু জরুরী কাজে আগত কয়েকজন বিশিষ্ট লোক আগেই তা দখল করে ফেলেছেন।

একটা প্রকাণ্ড পাথরের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। হিমালয়ে এমন সবুজ সুন্দর গ্রাম সত্যিই দুর্লভ। অদূরেই দেখা যাচ্ছে গ্রামের ঘরগুলি। তার অধিকাংশতেই শ্লেট পাথরের ছাউনি। আর দূরে, বহুদূরে তুষার ধবল দুনাগিরি শৃঙ্গ। চোখ জুড়িয়ে যায়।

চা খেয়ে সুজনের সঙ্গে আমিও বেরিয়ে পড়ি গ্রামের দিকে। সুজন অবশ্য সওদা করতে যাচ্ছে। মাংস-টাংস যদি পাওয়া যায়।

মালারীতে কিছু কিছু দোকানপাট রয়েছে দেখলাম। মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলির সবই প্রায় লভ্য এই সমস্ত দোকানগুলিতে। গ্রামের মধ্যে একটু ছোট বাজারও রয়েছে। সেখানে নাকি সকাল-সন্ধ্যায় কাঁচা সব্জী মেলে। এমন কি মুরগী-ভেড়ার মাংসও। শুনে সুজন আর এক মুহূর্তও দেরি করে না। মাংসের অর্ডার দিয়ে দেয়।

১৯৩১ সালে কামেট অভিযানে ফ্রাঙ্ক স্মাইথ যখন এ পথে আসেন, তখন মালারী আজকের মত এত জমজমাট ছিল না। মাংস, সব্জী, ডিম ইত্যাদি তখন বাজারে ঢেলে বিক্রি করা হোত না নিশ্চয়। দলের অন্যতম অভিযাত্রী শিপটন মুরগী অথবা ডিমের কোনটারই বন্দোবস্ত না করতে পেরে ভীষণ মুষড়ে পড়েছিলেন। অথচ আগাগোড়া আসবার পথে সকলেই তাঁকে বলেছিল মালারীতে এ সমস্ত জিনিসের সবই পাওয়া যায়। শিপটন আজকের মালারীতে আসতে পারলে নিশ্চয় খুব খুশি হতেন। কারণ ডিম-মাংস সবই আজ পাওয়া যায় এখানে।

সুজন মাংস হাতে নিয়ে বলে—আমি চলিরে। তাড়াতাড়ি কেটেকুটে এখনই না বসাতে পারলে পরে দেরি হয়ে যাবে। তুই বরং পরে আয়।

সুজন চলে যায়। আমি এসে একটা চায়ের দোকানে বসি। বাচ্চা ছেলের দল আগেই আমাদের ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল। আমি উঠে এসে দোকানে বসতেই ওরাও সকলে এসে ঢোকে এক সঙ্গে। তাই দেখে দোকানী ওদের সকলকে দোকানের বাইরে চলে যেতে বলে। তারপর একগাল হেসে সে আমাকে অভ্যর্থনা করে—কুছ চাহিয়ে সাব?

আমি এক গ্লাস চায়ের অর্ডার দিয়ে বলি—বাচ্চে লোগকো রহেনে দিজিয়ে।

শুনে ছেলেরা খুব উৎসাহ পায়। কয়েকজন একেবারে আমার গা ঘেঁষে বসে। তারপর জিজ্ঞেস করে নানা প্রশ্ন। কোত্থেকে এসেছি, যাবোই বা কোথায়? সরকার পাঠিয়েছে না অন্য কেউ? এত বড় দল এ পথে এর আগে কেউ আসতে দেখে নি।

শুনে দু'একজন বয়স্ক লোক অবশ্য তাদের বোঝায়, না, ইতিপূর্বে আরো দু' একটি এমনি বড় দলকে তারা আসতে দেখেছে। তারাও এসেছিল পাহাড়ে চড়তে। সালটা ঠিক মনে নেই। তবে এই দলে

যারা এসেছে তাদের কয়েকজন সেবারেও এসেছিল বলেই তাদের ধারণা।

বলা বাহুল্য, সমস্ত ব্যাপারটা আমার বুঝতে কষ্ট হয় না। ১৯৬১ সালের নানা অভিযাত্রীদের কথা সম্ভবতঃ তারা বলছে। আমি বলি—আপ ঠিকহি বাতায়া। একষট সালমে উ লোগ আয়ে থে।

এমনিভাবে নানা কথার মধ্য দিয়ে বেশ খানিকক্ষণ সময় কেটে যায়। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। সঙ্গে গরম কিছু নিয়ে আসি নি। তাই দোকানীকে পয়সা চুকিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি।

॥ পাঁচ ॥

পরদিন। আজকের গন্তব্যস্থল নিতি। যথারীতি রোদ ওঠার আগেই আমরা বেরিয়ে পড়ি পথে।

পথে পড়ল বামপা ও গামশালী গ্রাম। ধৌলী ও বাঙ্কে উপত্যকার সংযোগস্থলে পাশাপাশি এই দু'টি সমৃদ্ধ পাহাড়ী জনপদ। উভয়ের দূরত্ব সামান্যই। এক মাইলের মত হবে। হিমালয়ের গহন কন্দরে এমন জমজমাট জনপদ যে থাকতে পারে, তা ছিল আমার কল্পনাতীত। বামপাতে ডাকঘর আছে, আছে হাসপাতাল আর নানা ধরনের দোকানপাট। তার মধ্যে কবিরাজী ওষুধের দোকানটিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। যাবতীয় রোগের ওষুধ সেখানে পাওয়া যায়।

পর্বতারোহী স্মাইথের সময়ে ওষুধের দোকান, হাসপাতাল ইত্যাদি হয়তো ছিল না। থাকলে নিশ্চয় তিনি তার বই-এ উল্লেখ করতেন। কিন্তু তিনি এখানকার এই ডাকঘরটি দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। আমরাও ভেবে বিস্মিত হয়েছিলাম, তখনকার দিনে এগারো হাজার ফুটেরও উপরে ডাকঘর!

ধৌলীগঙ্গার ডান তীরে গামশালীও বেশ সমৃদ্ধ গ্রাম। এখানকার

চেকপোস্টে ইনার লাইন পারমিট দেখাতে হল। আমার পারমিট দেখে চেকপোস্টের পুলিশ একটা খাতা বের করে আমার সামনে ধরল—কাঁহাসে আয়া, কি ধার জানা, কিত্‌না দিন ঠারেঙ্গে, ওয়াপস্‌ আয়েঙ্গে কভ্‌ সব কুছ্‌ লিখ দিজিয়ে, এক নিঃশ্বাসে বলে গেল পুলিশটি।

আমি কোন কথা না বলে খাতাতে সব লিখে দিই, কিন্তু পুলিশটি পুনরায় আমাকে প্রশ্ন করে—কিত্‌না আদমী হ্যায় আপ-লোগ?

—কুলী শেরপা মেম্বার লোগ সব মিলাকে সউ হোগা…

—ব্যাস, ইত্‌নাই?

—জী হাঁ। লেকিন ঘোড়ে খচ্চর ঝব্ব্‌ (চমরীগাই) ভী হ্যায়…

—তব্‌…

—তব্‌ ক্যায়া, এবারে আমি বিস্মিত হই।

—এক সউ সে জাদা হো যাতা হ্যায়, পুলিশটি গোঁফে তা দিতে দিতে বলে।

—বিলকুল ঠিক্‌। লেকিন আদমী তো এক সউ সে জাদা নহী। আমি হাসি চেপে রাখতে পারি না।

—নেহি, আপ অফিস মে চলিয়ে, বলেই পুলিশটি ত্রস্ত পায়ে আমার পেছনে এসে দাঁড়ায়—চলিয়ে, জলদী চলিয়ে।

ভীষণ অস্বস্তি লাগে। লোকটা বলে কী? তবে কি সে আমাকে ঠাট্টা করছে? আমার পিঠে রুকস্যাক, পরনে ক্লাইম্বিং প্যাণ্ট, হাতে তুষারগাঁইতি দেখে কি তার সন্দেহ হয়েছে আমি গুপ্তচর বা অন্য কিছু? আমার সঙ্গীরা এখনও পেছনে। কি করা উচিত ভেবে পাই না। কিন্তু লোকটি অধৈর্য হয়ে ওঠে। আমাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে পেছন থেকে প্রশ্ন ছোঁড়ে—আপ এক্সপিডিশন যানেওয়ালী…

—জী হাঁ। বলে আমি পুনরায় তাকে ইনার লাইন পারমিটখানা বের করে দেখাই—ইস মে হামারাওয়াস্তে সব কুছ্‌ লিখ দিয়া হোগা, আপ কৃপা করকে পঢ় লিজিয়ে।

সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে মুহূর্তের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল। লোকটি জানাল, সে লেখা-পড়া জানে না। আর তাই সে চেকপোস্টে পুলিশের চাকরি নিয়ে এত দুর্ভোগ সইছে।

কয়েকজন কুলী ইতিমধ্যে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাদের একজন তাকে সব বুঝিয়ে বলল। বলল যে, আমি একজন অভিযাত্রী দলেরই লোক। তখন সে আমাকে ছেড়ে দিতে সম্মত হল।

এই গামশালীর সঙ্গে মিশে আছে হিমালয়ের এক বিস্ময়কর আবিষ্কারের ইতিহাস। ১৯৩১ সালে কামেট বিজয় করে এই গামশালী দিয়েই ফিরছিলেন ফ্রাঙ্ক স্মাইথ। হঠাৎ শুরু হল তুষার-ঝড়। সঙ্গে ছিলেন আর. এল. হোল্ডসওয়ার্থ। আকস্মিক ঝড়ে তাঁরা বিব্রত হয়ে পড়েন। দিশেহারা হয়ে পাগলের মত দু'জনে ছুটতে থাকেন ঝড়ের মধ্যে। অবশেষে যখন ঝড় থামল, দেখলেন তাঁরা পথ ভুল করে উপস্থিত হয়েছেন এক অনিন্দ্যসুন্দর উপত্যকায়। যতদূর দৃষ্টি যায়, চারিদিকে কেবলই ফুল আর ফুল। বিচিত্র বর্ণের আর বিচিত্র গন্ধের। মনে হল তাঁরা দু'জনে নন্দনকাননে দাঁড়িয়ে আছেন। হোল্ডসওয়ার্থ নাম রাখলেন 'ফ্লোরা ভ্যালী' আর স্মাইথ 'ভ্যালী অব ফ্লাওয়ার্স'।

স্থানীয় লোকেরা আজ সেই উপত্যকাকে বলেন, 'ফুলো কা ঘাঁটি'। আর শ্রী বুদ্ধ বসু নাম রেখেছেন 'নন্দনকানন'।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। দূরে বাঙ্কে উপত্যকা। ১৯৩৭-সালে স্মাইথ মানা আরোহণের জন্য এ পথ দিয়েই যান। তিনি দক্ষিণ দিক থেকে বাঙ্কে হিমবাহ অনুসরণ করে মানা আরোহণ করেছিলেন।

কিন্তু আমাদের পথ উত্তর দিক থেকে। পূর্বি কামেট হিমবাহ ধরে আমাদের অগ্রসর হতে হবে মানার দিকে। স্মাইথের মতে, মানার উত্তরগাত্র ভয়াবহ ও বিপজ্জনক।

স্মাইথের ধারণা, উত্তর দিক থেকে মানা আরোহণ অবাস্তব। কারণ

১৯৩১ সালে কামেট আরোহণের সময়েই তিনি খুব কাছে থেকে মানার উত্তর গাত্রের গঠন-বৈচিত্র্য দেখেছিলেন। এ পথ দিয়ে দুর্গম মানা শিখরে আরোহণ করা সম্ভব হবে না বলেই বোধ করি ১৯৩৭ সালে স্মাইথ গামশালী দিয়ে মানার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন।

উত্তরের এই ভয়াবহ পথ যে মানা আরোহণের অনুকূলে নয়, সেকথা হিমালয় অভিযানের অন্যতম পথিকৃৎ ডাঃ টি. জি. লংস্টাফও বলেছিলেন। ১৯০৭ সালে লংস্টাফ একটি দল নিয়ে এ পথে এসেছিলেন। ত্রিশূল (২৩,৪০৬ ফুট) আরোহণের পরে তিনি মানা ও কামেটের সম্ভাব্য পথ খুঁজে বের করবার জন্য এ অঞ্চলে ব্যাপক সমীক্ষা চালান। তাঁর মতে স্মাইথ যে পথে আরোহণ করেন, সে পথও অবাস্তব ছিল। সেজন্য ওই পথ ছেড়ে তিনি কামেটের দিকে অগ্রসর হন। এবং ষোল হাজার ফুট উঁচুতে কামেট হিমবাহের (পূর্বি কামেট হিমবাহ) উপর একটি শিবির স্থাপন করেন। কিন্তু সব দেখেশুনে উপরের দিকে অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। কারণ তাঁর ভাষায় 'To follow the glacier further would have been very risky woing to the dangerous hanging glaciers which drop the northern sloves of Mana peak.

গামশালীর উল্টো দিকেই নিতি গ্রাম। মাঝখানে এক বিরাট উঁচু গিরি-প্রাচীর থাকায় পথ গিয়েছে ধৌলীগঙ্গার ধার ঘেঁষে। প্রথম দিকে বেশ খানিকটা উৎরাই, কিন্তু তার পরেই বিকট চড়াই।

মালারী থেকে ন' মাইল এবং যোশীমঠ থেকে চুয়াল্লিশ মাইল দূরে নিতি এ পথের শেষ গ্রাম। উচ্চতা ১১৮৫৭ ফুট। এই গ্রাম থেকে তিব্বত সীমান্ত খুবই কাছে। ১৬,৬০০ ফুট উঁচু নিতি গিরিপথ তিব্বত ও ভারতের সংযোগকারী গিরিপথ। নিতি থেকে মাত্র ২৮ মাইল দূরে। আগে এ পথ দিয়ে উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। নিত্য নতুন মানুষের আনাগোনায় মুখর হয়ে থাকত সীমান্তের এই

গ্রামগুলি। কিন্তু আজ রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে পড়ে সে পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। এখন উভয় সীমান্তে সশস্ত্র প্রহরা।

আগে বহু তীর্থযাত্রী নিতি গিরিপথ পার হয়ে কৈলাস-মানস সরোবর পরিক্রমায় যেতেন। নিতি থেকে আরো দু'টি পথ রয়েছে কৈলাস-মানস সরোবরে যাবার। একটি হোতি-নিতি গিরিপথ (১৬,৩০০ ফুট) ও অপরটি ডোমযান-নিতি গিরিপথ (১৬,২০০ ফুট)।

নিতিও খুব সমৃদ্ধ গ্রাম। প্রায় শ'দেড়েক পরিবারের বাস। তবে তাদের কেউই স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস করতে পারে না। কারণ শীতের সময় এখানে অসহ্য ঠাণ্ডা পড়ে, ঘরবাড়ি সব বরফের নীচে চাপা পড়ে যায়। তাই শীতের আরম্ভে ফসল ঘরে তুলে গ্রামবাসীরা নিচে নেমে যায়—যোশীমঠের দিকে। গ্রীষ্মের সময় অর্থাৎ এপ্রিল-মে মাস নাগাদ বরফ গলার সঙ্গে সঙ্গে আবার তারা আসে ফিরে।

গ্রামের একপাশে একফালি সমতল জায়গায় আমাদের তাঁবু লাগানো হল। দেখতে দেখতে আবার আমাদের অস্থায়ী ঘরকন্না শুরু হয়ে গেল। গ্রামের আবালবৃদ্ধবণিতা এসে ঘেরাও করল আমাদের। কৌতূহলী চোখ নিয়ে লাল টুকটুকে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের দল আবার ভীড় জমালো তাঁবুর ভেতরে।

দিলীপদার সামান্য জ্বর হয়েছে। রাত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল আগামীকাল এখানে পূর্ণ বিশ্রাম। তবে ভোরে নিমাইদা, তাপসদা, সুজন এবং নারায়ণ উপরে যাবে কয়েকজন শেরপা আর লকুলকে নিয়ে। তারা বেসক্যাম্প বা মূলশিবিরে যাবার পথে রাইকানা ও ধৌলীর সঙ্গমস্থলের উপর পারাপারের জন্য প্রয়োজনীয় পুল তৈরি করার প্রাথমিক কাজ সেরে আসবে।

পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী পরদিন খুব সকালে খাবার-দাবার সঙ্গে নিয়ে ওরা রওনা হয়ে গেল। আমাদের হাতে আছে অফুরন্ত

সময়। তাই মনের আনন্দে গ্রামের এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। বিশেষ আমন্ত্রণে দু'চারজন গ্রামবাসীর আতিথ্যগ্রহণ করতে হল। গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রী এস. এস. রাণা আমাদের চা-চক্রে আপ্যায়িত করলেন। সে এক অভিনব অভিজ্ঞতা। তাঁর দোতলার ঘরে তিনি পুরু নরম কার্পেটের উপর কারুকার্যময় পশমের কম্বল বিছিয়ে বসতে দিলেন আমাদের। বেশ ছিমছাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর। তেমনি পরিপাটি করে সাজানো গোছানো। আসবাব-পত্রের আধিক্য নেই। তবে রেডিও, দেওয়াল ঘড়ি, ইত্যাদির মধ্যে শহুরে সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে তাঁর ঘরে।

রাণা সাহেব কথা বলেন কম, হাসেন বেশি। তিনি তাঁর পরিবারের ছেলেমেয়েদের ডেকে এনে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ওরা হাত জোড় করে নমস্কার করে আমাদের। সুন্দর ফুটফুটে সব ছেলেমেয়ে। অচেনা অপরিচিত বলে প্রথমে খানিকটা সঙ্কোচ করলেও পরে ওরা খুবই সহজ হয়ে গেল।

কথায় কথায় রাণা সাহেব তার নবজাত কন্যার কথা বললেন। একমাস বয়স হয় নি এখনও—বলে তিনি তার বড় মেয়েকে ইশারা করতেই সে উঠে চলে গেল পাশের ঘরে। তারপর নিয়ে এল একটি বিচিত্র কারুকার্য শোভিত কাঠের বাক্স। বেশ কয়েকখানা পুরু পশমী কাপড় দিয়ে বাক্সটার মুখ ঢাকা।

রাণা সাহেব হাসতে হাসতে ঐ বাক্সের উপরের কাপড়গুলো সরিয়ে দিতেই তার মধ্যে নজরে পড়ল নবজাত শিশুটি। লাল টুকটুকে যেন একটি মাংসপিণ্ড। অপার বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছে। আঙুল চুষছে শুয়ে শুয়ে।

দেখে আমি চমকে উঠি। এইভাবে একটা অবোধ শিশুকে পশমের কাপড়ে-চোপড়ে সম্পূর্ণ আবৃত করে রাখা হয়েছিল। দম বন্ধ হয়ে যে মারা যায় নি সেটাই ভাগ্যের কথা।

আমার কথা শুনে রাণা সাহেব হাসলেন। বললেন—এই প্রচণ্ড

ঠাণ্ডায় শিশুদের এইভাবে রাখাই এখানকার রীতি। অত উঁচুতে জন্মগ্রহণ করে বলে, জন্ম থেকেই শিশুদের ফুসফুসে প্রবল শক্তি। অতএব ওভাবে ঢেকেঢুকে রাখলেও ওদের কোন কষ্ট হয় না। আমরাও তো এইভাবেই বড় হয়েছি।

এমন সময় রাণা পরিবারের মেয়েরা ঘরে ঢুকলেন। তাঁদের আপাদমস্তক পশমী পোশাকে আবৃত। শুধু মুখখানা খোলা। গলায়, কানে ও নাকে সুদৃশ গয়না। হাতে বিচিত্র বর্ণের চুড়ি। কালো কুচকুচে বিনুনি পিঠের উপর লুটিয়ে পড়েছে।

ভাল করে লক্ষ্য করলাম, ভারি সুন্দর মুখশ্রী। টিকলো নাক-মুখ, দীঘল কালো চোখের তারা। লাল গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁট। অপরূপ সাজে সেজেছে তারা। এমন ফেটে পড়া রূপ আমি আর কখনও দেখি নি। ওঁরা আমাদের চা পরিবেশন করতে এসেছেন। লজ্জাবনত মস্তকে ওঁরা প্রথমে আমাদের সামনে চীনামাটির ছোট ছোট বাটি রেখে তাতে গরম চা ঢেলে দিলেন। তারপর নীলাভ রঙের খানিকটা করে শক্ত ইটের মত মাখন দিলেন চায়ের মধ্যে। উৎকট বিশ্রী গন্ধ তার। সবশেষে দিলেন একটুখানি নুন।

রাণা সাহেব বললেন—এই নিমকিন চা অত্যন্ত বলকারক, বিশেষ করে ঠাণ্ডার দেশে। এই চা শরীরকে গরম রাখতে খুব সাহায্য করে। ইচ্ছে করলে এই চায়ের মধ্যে মকাই-এর ছাতু পাতলা করে মিশিয়েও খাওয়া যেতে পারে। তাতে একসঙ্গে খাদ্য ও পানীয়ের চাহিদা মেটে।

এই বলে তিনি একটি কাঠের পাত্র থেকে খানিকটা ছাতু তুলে নিয়ে নিজের চায়ের বাটিতে ঢেলে দিলেন। আমরাও দেখাদেখি তাই করলাম। শুধু চা খেতে প্রথমে যে গন্ধ নাকে আসছিল, ছাতু মেশানোর পরে তা আর অতটা লাগল না। তবে খুবই কষ্টে ছাতু মেশানো নিমকিন চা নিঃশেষ করতে পারলাম।

রাণা সাহেব খুব খুশি, খুশি মেয়েরাও। আরো খাবার জন্য তারা

খুব পীড়াপীড়ি করলেন, কিন্তু আমরা রাজি হলাম না। তবে বিস্তর আড্ডা দিতে হল। রাজনীতি, দেশের ভূত-ভবিষ্যৎ, আগামী নির্বাচন ও হিমালয় ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে করতে ঘণ্টা দু'য়েক সময় যে কোথা দিয়ে কেটে গেল, আমরা টেরই পেলাম না। অবশেষে আমরা বিদায় নিয়ে আমাদের শিবিরে ফিরে এলাম।

এসে দেখি দিলীপদা তাঁবুর বাইরে রোদে পা ছড়িয়ে বসে আছেন। আর তাঁকে ঘিরে একগাদা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। বোধ করি দিলীপদা তাদের সঙ্গে ভাবসাব জমিয়ে থাকবেন। দেখলুম, তারা খুব সহজ ভাবেই দিলীপদার সঙ্গে বেশ হাসি-ঠাট্টা-তামাসা করছে।

দিলীপদা তাদের গান গাইতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা সমস্বরে চীৎকার করে গান ধরল :

হমারী সীমা পর্ যো কোই আ লো
ঘাষজনা কাটি দিলা বুখনাজনা বুকাই দিওলা হো।
উয়ারী রহেগী মানা ঘাঁটি পার বরাহোতি
বীচ ম বসুচ ঘাঁটি বড়ি নিতি।
ঘাষজনা কাটি দিলা বুখনাজনা বুঝাই দিওলা হো।
কচ্ছ, পাঞ্জাব ঔর রাজস্থান ভারত কা বীর হম্
নিতি ঘাঁটি কা জওয়ান।
নিতি কী সীমা পর্ যো কোই আ লো···

অর্থাৎ আমার সীমানার মধ্যে কোন শত্রু এলে আমি তাকে ঘাসের মত কেটে চিবিয়ে চিবিয়ে খাবো। শত্রু, তুমি জেনে রেখো, আমাদের একদিকে মানা ঘাঁটি আর একদিকে বরাহোতি। আর মাঝখানে হচ্ছে সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটি এই নিতি। কচ্ছ, পাঞ্জাব আর রাজস্থানের বীর, আমি বীর ভারতের। আমি নিতির নওজওয়ান। অতএব তুমি আমার ঘাঁটিতে ঢুকেছ কি আর রক্ষে নেই। আমি তোমাকে ঘাষের মত কাটব আর চিবিয়ে খাবো।···

অদ্ভুত দরদ দিয়ে গানটি গাইল ছেলেমেয়েরা। গান শেষ হতেই বিশ্বদেবদা সকলকে লজেন্স দিলেন। লজেন্স পেয়ে তারা সে কি খুশি। আনন্দে আবার নাচতে শুরু করে দেয়। দীপক তাড়াতাড়ি ঢোল নিয়ে আসে। নাচের তালে তালে ঢোল বাজিয়ে সে ছেলেমেয়েদের উৎসাহিত করতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে সকলে ভুলে যায় স্থান কাল ও পাত্রের কথা। এক অভূতপূর্ব আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যে হয়ে এল। নিমাইদারা এখনও ফিরে এলেন না। আমরা শঙ্কিত। সন্ধ্যের আগে শিবিরে ফিরে আসতে হবে—এটাই হিমালয় অভিযানের প্রচলিত বিধি। প্রতিমুহূর্তেই ওঁরা ফিরে আসবেন এই আশায় আরো বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল। কিন্তু তাঁরা ফিরে এলেন না। তা হলে কি কোন বিপদ-আপদ অথবা দুর্ঘটনা ঘটেছে?

বিশ্বদেবদা এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। সঙ্গে দু' ফ্লাস্ক ভর্তি গরম চা আর কিছু বিস্কুট নিয়ে নেওয়া হল। আর ওয়াটার বটল্-এ জল। ক্লান্ত, শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত বন্ধুদের এগুলো অনেক কাজে লাগবে।

দুটো হ্যাজাক আর টর্চের আলোয় আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি। একে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, তার উপরে অপ্রশস্ত পথ। পাহাড়ের গা এঁকে-বেঁকে উঠে গিয়েছে। রীতিমত বিপজ্জনক পথ। নানা অজানা আশঙ্কায় আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি। অনেক নিচে ধৌলীগঙ্গা। তার একঘেয়ে কলোচ্ছ্বাসের শব্দ সর্বদা কানে আসছে।

পথ চলতে চলতে নানা দুর্ভাবনাই মনে এল। ধৌলীগঙ্গার উপর পুল তৈরি করার প্রাথমিক কাজ করতে গিয়ে কি ওদের কেউ জলে ভেসে গেছে? অথবা পাহাড়ের ওপর থেকে হঠাৎ কোন পাথর গড়িয়ে পড়েছে কারও উপর? কিম্বা কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে!

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে একটি প্রকাণ্ড গিরিশিরার গা দিয়ে নামবার সময় আমরা ওদের দেখতে পেলাম। ওরা সকলেই পরিশ্রান্ত,

ক্ষুৎপিপাসায় কাতর। পাসাং ফুতার তাড়াতাড়ি চা আর বিস্কুট বের করে খেতে দেয় সকলকে।

শিবিরে ফিরে শুনলাম, ধৌলীর উপর সেতু নির্মাণের জন্য নিমাইদারা প্রায় পঞ্চাশ ফুট লম্বা ও আট ইঞ্চি চওড়া একটি কাঠের 'লগ্' ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ধৌলী এতই চওড়া ও জলভারে স্ফীত যে ওই লগ্ লাগানোর কোন প্রচেষ্টাই সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। সেজন্য তারা পাথর ফেলে নদীর পার বাঁধার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু সারাদিনের এই হাড়ভাঙা পরিশ্রম পুরোপুরিই ব্যর্থ হয়েছে বলা যায়। ধৌলীর প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মুখে সেই সমস্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর ছোট্ট নুড়ির মতই নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। নিমাইদা বলেন—আগামীকালও আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে পুল তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। কারণ পুল তৈরি না করতে পারলে আর এক পা-ও এগুনোর কোন সম্ভাবনা নেই।

একদিন বিশ্রামের পর আবার আজ আমাদের যাত্রা হবে শুরু। ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিবির কর্মচঞ্চল হয়ে উঠল। কুলীরা সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে মালপত্র নেবার জন্য। ঘোড়াওয়ালারা মালপত্র বাঁধাছাদা শুরু করেছে।

প্রত্যেক পর্বতাভিযানে কুলীদের সামলে নিয়ে ঠিক ঠিক কাজ করা এক দুরূহ ব্যাপার। আগেই বলেছি, মদনদার কুলী সামলানোর অভিজ্ঞতা প্রচুর। তিনি জানেন, কি করে কেমনভাবে কাজ আদায় করে নিতে হয়। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, তাই মদনদা সাত সকালে ঘুম থেকে উঠেই কুলীদের কথা শুনছেন, বোঝাচ্ছেন। মালপত্র ভাগ-বাঁটোয়ারা করে সবাইকে দিচ্ছেন। সুজন আর নারায়ণ তাঁকে সাহায্য করছে। কুলীদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য মদনদা সিগারেট আর দেশলাই দিচ্ছেন।

সুজন কোলে ও নারায়ণ রক্ষিত পর্বতাভিযানে নবাগত।

অভিযানের অভিজ্ঞতা তাদের নেই, কিন্তু তারা বয়সে তরুণ এবং পরিশ্রমী। তারা সর্বদাই কাজে ব্যস্ত থাকে। কলকাতাতেও দেখেছি এদের, মালপত্র প্যাকিং বা কেনাকাটার সময় তারা মুখ বুজে কর্তব্য সম্পাদনে সর্বদা ব্যস্ত থাকত।

সুজন এবং নারায়ণ পর্বতারোহণের পাঠ নিয়েছে দার্জিলিং থেকে। সুজন বেসিক ট্রেনিং নিয়েছে, আর নারায়ণ নিয়েছে বেসিক ও এ্যাডভান্স।

ধৌলী উপত্যকার অন্তর্গত সেপুক সমুদ্রতল থেকে ১২,৬০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। একটু উপরেই রাইকানা ও ধৌলীগঙ্গার সঙ্গম। এই ধৌলী অতিক্রম করে রাইকানা নদীকে বাঁয়ে রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে মূল শিবিরের দিকে—বসুধারাতালে। তাল মানে হ্রদ।

গাছপালাহীন সেপুক নেড়া পাথুরে পাহাড়ে ঘেরা। উপত্যকা দিয়ে সর্বদাই তীব্র ঠাণ্ডা ও শুকনো বাতাস বইছে। কেমন যেন রুক্ষ কর্কশ এখানকার পরিবেশ। চারিদিকে ছোট-বড় নানা আকারের পাথর পড়ে রয়েছে। তারই মাঝে কোথাও কোথাও ঘাসের আস্তরণ। নদীর ধারে জুনিপারের ঝোপ।

আমাদের বারোটি ভেড়া এখানে পৌছেই ঘাসের সন্ধানে-বেরিয়ে গেল। পিঠ থেকে মালপত্র নামিয়ে নিতেই ঘোড়া, খচ্চর, আর চমরী-গাই-এর দলও নদীর ধারে চলে গেল।

আমি ভাবছি শান্ত নিরীহ ভেড়াগুলির কথা। ওরা জানে না যে যারা রক্ষক তারাই ভক্ষক।

পিঠ থেকে রুকস্যাকের বোঝা নামিয়ে আমরা সকলে সঙ্গমের দিকে গেলাম। রাইকানা ক্ষীণকায়া। স্রোতহীন বললেই চলে। ধৌলী প্রশস্ত ও অশান্ত। পাথরের শত-সহস্র বাধাকে অবলীলাক্রমে নস্যাৎ করে দিয়ে সে তীব্রগতিতে বিপুল গর্জনে রাইকানাকে বুকে টেনে নিয়েছে।

নদীর এপারে ধৌলী উপত্যকার শেষ, ওপারে রাইকানা

উপত্যকায় শুরু। রাইকানা উপত্যকায় যেতে হলে খরস্রোতা ধৌলীর বরফগলা জল পায়ে হেঁটে পার হওয়া রীতিমত দুঃসাধ্য ও বিপজ্জনক। তাই ধৌলীর উপর সেতু নির্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন। ১৯৬১ সালেও মানা অভিযানকালে এই ধৌলীর উপর সেতু নির্মাণ করতে হয়েছিল। তা ছাড়া এই সেতু না হলে সভ্য জগতের সঙ্গে সংযোগ রাখাও দুঃসাধ্য।

সকলেই হাত লাগাল পুল তৈরির কাজে। সদস্য, শেরপা আর নকুলের দল—কেউই বাদ নেই। এমনকি কুলীরা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। তাদের মনেও প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা। যেমন করেই হোক এই দুস্তর বাধা অতিক্রম করতে হবে।

গতকাল নিমাইদারা ধৌলীর পার বাঁধতে গিয়ে কী অমানুষিক পরিশ্রম করেছিলেন তার নমুনা আজ আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম। কত না রাশি রাশি পাথর তাঁরা ফেলেছিলেন নদীর পাড়ে পাড়ে। কিন্তু তার অধিকাংশই জলের তোড়ে ধুয়ে-মুছে গেছে। এখন তার সামান্য কিছু নিদর্শন রয়েছে। আমরা তারই উপর বড় বড় পাথর ফেলতে লাগলাম।

অনেকক্ষণ ধরে চলল এই পাথর ফেলার কাজ। রীতিমত শ্রমসাপেক্ষ কাজ। একই জায়গায় পাথর ফেলে ফেলে পাড় বেঁধে আমরা নদীর প্রায় মাঝ বরাবর এগুতে চেষ্টা করছি।

দীর্ঘ পরিশ্রমের পর আমরা অবশেষে সফল হলাম। পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে একটি উঁচু মজবুত পিলার তৈরি করলাম প্রথমে। তারপর তার উপর লগটাকে রেখে অত্যন্ত কায়দা-কসরৎ করে ওপারের মাটিতে ফেলে দেওয়া হল আস্তে আস্তে।

এবারে এই অশক্ত লগের উপর দিয়ে একজনকে অন্ততঃ ওপারে পাঠাতে হবে। তা নইলে শুধুমাত্র এপার থেকে লগটাকে সঠিক ভাবে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না।

কিন্তু কে যাবে এই অপ্রশস্ত লগের উপর দিয়ে? দুরন্ত বেগে

ধৌলীর বরফগলা জল ছুটে চলেছে লগের উপর দিয়ে। জলভারে থরথর করে কাঁপছে। ভারসাম্য বজায় রেখে এর উপর দিয়ে ওপারে হেঁটে যাওয়া মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। সামান্ত এদিক-ওদিক হলে উন্মত্ত জলরাশি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আছাড় মারবে পাথরে। কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না।

শেরপা ফু তেনজিং বয়সে তরুণ। অফুরন্ত তার উৎসাহ। সে এই কাঠের লগ পেরিয়ে ওপারে যেতে প্রস্তুত এবং রাজি। এ সুযোগ থেকে যেন তাকে কিছুতেই বঞ্চিত না করা হয়।

শুনে শেরপা সর্দার লাকপা শেরিং আর পাসাং ফুতার কি যেন বলল ওকে। তারপর তার কোমরে দড়ি বেঁধে এপার থেকে দড়ি ধরে নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল। ফু তেনজিং খালি পায়ে বরফগলা জল ভেঙে এগিয়ে চলে।

রুদ্ধনিঃশ্বাসে আমরা ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। খানিকক্ষণ আগেও জলের এত তোড় ছিল না। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের তোড় বেড়ে গেছে। আর সেই সঙ্গে তার আস্ফালন। যেন ভেঙেচুড়ে সব তছনছ করে দেবে।

ভগবানকে স্মরণ করতে লাগলাম। ফু যেন নির্বিঘ্নে পার হয়ে যেতে পারে।

নদীর গর্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। একটু আগেও জায়গাটা সকলের কলকাকলিতে মুখরিত ছিল। কিন্তু এখন সবাই নির্বাক। চারিদিকে কেমন যেন এক অস্বস্তিকর পরিবেশ। শঙ্কাকুল নয়নে সকলেই তাকিয়ে আছে ফু তেনজিং-এর দিকে।

এক পা এক পা করে এগিয়ে চলেছে ফু তেনজিং। মাঝে মাঝেই বরফগলা জলের ঢেউ এসে তাকে ধাক্কা মারছে। কিন্তু নির্বিকার ধীর-স্থির পদক্ষেপে সে তার লক্ষ্যপথের দিকে এগিয়ে চলেছে।

এমন সময় পেছন থেকে হঠাৎ পাসাং ফুতার চিৎকার করে ডাকে —ফু তেনজিং!

চিৎকার শুনে ভয়ে আমার বুক কেঁপে ওঠে। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। যা ভাবছিলাম অবশেষে কি তা-ই হল? পা ফসকে ফু উন্মত্ত জলরাশির মধ্যে পড়ে গেল।

না, ফু তেনজিং পড়ে নি। সে অবিচল আস্থার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। পাসাং ফুতারের ডাক শুনে সে হাসতে হাসতে পেছন ফিরে তাকায়। এপার থেকে পাসাং চিৎকার করে বলে—ওপারে পৌঁছেই দড়িটা উপরের ওই পাথরের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দিও কিন্তু।—আচ্ছা। এই বলে ফু আবার নির্ভীক পদক্ষেপে এগিয়ে যায় সামনের দিকে।

অবশেষে আমাদের সমস্ত উদ্বেগ, ভয় ভাবনাকে কাটিয়ে ফু ওপারে পৌঁছে যায়। প্রবল করতালি আর হর্ষধ্বনি দিয়ে তাকে আমরা অভিনন্দন জানাই। অভিযানের প্রথম পর্যায়ে এ ধরনের আশাতীত সাফল্য দলের মনোবলকে সহস্রগুণে বাড়িয়ে দিল।

মুহূর্তের মধ্যে এদিক থেকে শেরিং লাকপা, গ্যালজেন, সোনা, নিমা থনডুপ ইত্যাদি শেরপা ও নকুল দড়ি ধরে ধরে ওপারে গিয়ে হাজির হয়। সেখানেও বিস্তর বোল্ডার আর পাথর সাজিয়ে সাজিয়ে নদীগর্ভে তারা একটি 'পিলার' তৈরি করে। তারপর এই উভয় পিলারের উপর কাঠের লগটাকে ঠিকমত বসিয়ে দড়ি দিয়ে শক্ত ও মজবুত করে বেঁধে দেওয়া হয়।

সকলেই খুশি। সভ্যজগতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী এই সেতু তৈরি করতে পেরে আমরা গর্বিত। শিবশঙ্করদা সকলকে গরম চা দিয়ে বিজয়-উৎসবের মুহূর্তটিকে উপভোগ্য করে তোলেন।

পর্বতারোহী লংস্টাফ বা স্মাইথের কাউকেই কিন্তু এ পথে পুল তৈরি করতে হয় নি। তাঁরা উভয়েই এ পথে এসেছিলেন জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে। অশান্ত ধৌলীর জলের উপরে তখনও কঠিন বরফের আস্তরণ। তাই ধৌলী উপত্যকা থেকে রাইকানা উপত্যকায় যেতে তাঁদের বেগ পেতে হয় নি একটুও। অতি সহজেই তাঁরা পার

হয়েছিলেন এপথ। এ প্রসঙ্গে স্মাইথ বলেছেন—'the Dhauli River has spanned by a great drift of avalaunch snow.'

১২,৬০০ ফুট উঁচুতে সেপুক রীতিমত ঠাণ্ডা। তার উপরে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে হাড় অবধি কাঁপিয়ে দিচ্ছে। গা গরম করার জন্য তাঁবুর ভেতর ঢুকতে যাবো এমন সময় ধ্রুবদা হাঁক দিলেন—এ্যাই প্রাণেশ, শুইন্যা যা।

Two-men Tent-এর সামনে বসে ধ্রুবদা শুধুমাত্র ডান হাতের গরম দস্তানা খুলে এক আঙ্গুলে টাইপ করছিলেন। আমি সামনে যেতেই তিনি মুখ তুলে বললেন—আমি একটা ডেসপ্যাচ পাঠামু কাইল, বুঝলি? পুলডা তোরা ক্যামনে বানাইলি, আমারে একটু ভাল কইর‍্যা ক'তো দেহি। আমারে রাইত হওয়নের আগেই রিপোর্টটা টাইপ কইর‍্যা রাখতে হইব। তা না অইলে কাইল ভোরে রাণার দিয়া যোশীমঠ পাঠাইতে পারুম না।

অগত্যা বসতে হল ধ্রুবদার কাছে। তিনি এক এক করে আমাকে প্রশ্ন করতে লাগলেন আর আমি তাঁর জবাব দিতে লাগলাম। বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগল রিপোর্ট তৈরি করতে। তারপর তিনি কেদার সিংকে ডাকলেন। সে-ই আগামীকাল সকালে যাবে এই ডেসপ্যাচ নিয়ে। ধ্রুবদা তাকে সব বুঝিয়ে দিলেন। যোশীমঠ পোস্টাপিসে গিয়ে তাকে কী কী করতে হবে ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে তিনি তা বলে দিলেন কেদার সিংকে।

যে-কোন পর্বতাভিযানে 'রাণার' অপরিহার্য। রাণার ছাড়া সভ্য জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব নয়। এজন্য তিনজন লোক বেসক্যাম্প থেকে যোশীমঠ পর্যন্ত শুধুমাত্র ডাক নিয়ে যাতায়াত করবে। এ ছাড়া তাদের আর কোন কাজ নেই। পোস্টাপিস এবং তারঘর বলতে এখানে ঐ যোশীমঠ, দূরত্বও অনেক। একজনের পক্ষে নিয়মিত ডাক নিয়ে যাওয়া বা নিয়ে আসা সম্ভবপর নয় বলেই তিনজন শক্ত-সমর্থ লোককে ধ্রুবদা একাজের

জন্য নিয়োগ করেছেন। তারা পালা করে 'রিলে' প্রথায় এই কাজ করবে।

খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সেজন্য রাণার তিনজনকে বর্ষাতি, টর্চ, নগদ টাকা এবং কিছু খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোন কারণেই তারা যাতে মাঝপথে আটকে না পড়ে।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এল সেপুকের বুকে। আমি ধ্রুবদার কাছ থেকে ফিরে আসি নিজের তাঁবুতে। ম্যানেজার শিবশঙ্করদা রাতের আহারেব বন্দোবস্ত করতে কিচেনে ভীষণ ব্যস্ত। পাচক ছুঞ্জে তার কাছ থেকে সব বুঝে নিচ্ছে।

কুলীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আশ্রয় নিয়েছে আশে-পাশের পাথরের আড়ালে কিম্বা গুহায়। তারা জুনিপারের কাঠ জ্বেলে খাবার-দাবার তৈরি করছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে তারা অনেকেই ওখানে কম্বল মুড়ি দিয়ে আগুনের পাশে শয্যা নেবে।

শেরপারাও তাঁবু টাঙায় নি। তারা উঁচু করে চারিদিকে মালপত্র ঘিরে ত্রিপল দাঁড় করিয়ে শোবার বন্দোবস্ত করেছে। পাথরের গুহার মত এতেও ঠাণ্ডা কম লাগে।

ক্রমশঃ রাত বাড়তে লাগল। স্তব্ধ হয়ে এল কলকোলাহল। শুধু একটানা বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ শুনতে পাচ্ছি। তার সঙ্গে ধৌলীর গর্জন মিশে এক অদ্ভুত ঐকতানের সৃষ্টি হয়েছে। পাশের তাঁবুতে গান হচ্ছে রেডিওতে। মাঝে মাঝে তার সুরও ভেসে আসছে বাতাসে।

সুন্দর ঝকঝকে সকাল। আবার যাত্রা শুরু হল। বিশ্বদেবদা, মদনদা, নিমাইদা, পাসাং ফুতার ও শেরপা সর্দার লাকপা শেরিংকে নিয়ে কুলীদের মালপত্র ওঠাতে সাহায্য করছেন। বাকি শেরপা ও নকুলরাও অবশ্য বসে নেই। তারাও যথাসাধ্য চেষ্টা করছে যাতে তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া যায়।

দড়ি ধরে ধরে অপ্রশস্ত কাঠের লগ পেরিয়ে কুলীরা অতি সন্তর্পণে ওপারে গিয়ে হাজির হল। ঘোড়া, খচ্চর আর চমরীগাই-গুলো (স্থানীয়রা বলে ঝব্বু) অবশ্য নদীর হিমশীতল জলের উপর দিয়েই ওপারে গিয়ে উঠল। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। বিশেষ করে ঝব্বুগুলো অত্যন্ত নির্বিকারভাবেই তাদের বিপুল দেহ নিয়ে মদমত্ত ধৌলীকে অতিক্রম করে গেল। শুনেছি এই চতুষ্পদরা বরফে চলতে খুবই অভ্যস্ত।

কিন্তু গোল বাঁধাল ভেড়ার পাল। কাঠের লগ পেরিয়ে ওপারে যেতে তাদের প্রবল অনীহা। তবু একরকম জোর করেই তাদের তুলে দেওয়া হল লগের উপর। কিন্তু তারা ফিরে এল। অবশেষে একটি কুকুরকে প্রথমে পাঠিয়ে দেওয়া হল। বোধ করি তাই দেখে ভেড়াগুলি ভরসা পেল। সঙ্গে সঙ্গে ওরা দল বেঁধে এগিয়ে গেল তাড়াতাড়ি। কিন্তু হঠাৎ মাঝখান থেকে দু'টি ভেড়া ঝুপ্ করে পড়ে গেল নিচে জলের মধ্যে। তাই দেখে সকলে হৈ হৈ করে চিৎকার করে উঠল—গেল, গেল।

সে কি করুণ দৃশ্য। ভেড়া দুটো কখনও ডুবছে আবার কখনও বা ভেসে উঠছে। মুহূর্তের মধ্যে প্রবল স্রোত তাদের ভাসিয়ে নিয়ে চলল দূরে—বহু দূরে পাথরে ধাক্কা খেতে খেতে। দিলীপদা পুলের উপর দিয়ে লোকজন পারাপারের ছবি তুলছিলেন মুভি ক্যামেরাটাকে দাঁড় করিয়ে। পাসাং একাজে তাকে সাহায্য করছিল। ভেড়া দুটো পড়ে যেতেই তিনি তৎক্ষণাৎ সব ফেলে তীর দিয়ে ছুটে চললেন ভেড়ার পেছনে। তার দেখাদেখি শেরপারাও ছুটছে। অবশেষে বহুকষ্টে তারা ভেড়া দুটোকে উদ্ধার করে নিয়ে এল।

খুব বেশি হলে সেপুক থেকে নন্দাখরক পৌঁছুতে ঘণ্টা তিনেক সময় লাগে। চড়াই পথ হলেও তেমন মারাত্মক নয়। ধীরে ধীরে উঠে গেছে।

পথের দু'দিকে শ্বেতশুভ্র গিরিশিরা। তারই ঢালু গা বেয়ে

ছোট-বড় নানা আকারের রাশি রাশি পাথর (স্ক্রি) এসে নেমেছে রাইকানা উপত্যকার বুকে। এরই পাশ দিয়ে দিয়ে আমরা পথ খুঁজে নিয়ে এগিয়ে চলেছি।

মাঝে মাঝে তৃণভূমি নজরে পড়ছে। কয়েকজন মেষপালকের সঙ্গেও দেখা হল। হাজার হাজার ভেড়া নিয়ে ওরা এসেছে এই তৃণচারণ ভূমিতে। সিকিম হিমালয়ের চৌরিকিয়াং-এর সঙ্গে এ উপত্যকার সাদৃশ্য আছে। বরফ আর পাথরের মধ্যে এমন সবুজ ঘাসের সমারোহ বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। সাড়ে চৌদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে এ ধরনের তৃণভূমি সত্যিই মনোরম।

নন্দাখরকে যখন পৌঁছুলাম তখন বেলা সোয়া নয়টা হবে। পাসাং ফুতার আমার সঙ্গে ছিল। সে বলল রাইকানা অতিক্রম করে আমাদের তাঁবু পড়বে। ১৯৬১ সালে ফুতারও মানা অভিযানে এসেছিল। কাজেই রাস্তা তার নখদর্পণে। এমন কি, কোন জায়গায় কত উঁচুতে গতবারে তাঁবু পড়েছিল তাও তার অজানা নেই। সুতরাং আমি তাকে প্রায় চোখ বুজেই অনুসরণ করি।

রাইকানা নদীর উপর একটি পুল ছিল। মনুষ্যসৃষ্ট নয়, প্রকৃতির আপন খেয়ালেই তৈরি হয়ে রয়েছে একটি পাথরের পুল। ম্যাপে এর উল্লেখ আছে দেখেছি—ন্যাচারাল বোল্ডার ব্রিজ। আমরা এই পুল পার হয়ে পাথরের ধ্বংস্তূপের ওপর দিয়ে ওঠা-নামা করতে করতে যখন বেস-ক্যাম্প বা মূলশিবিরের জায়গায় পৌঁছুলাম, তখন বেলা প্রায় দেড়টা।

প্রচণ্ড বাতাস। ঠাণ্ডায় দাঁত-কপাটি লেগে যাবার যোগাড়। আমরা পিঠ থেকে রুকস্যাক নামিয়ে পাথরের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিই।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক সময় কেটে গেল এক জায়গায় বসে বসে। এখনও কুলী, শেরপা, নকুল এমনকি একজন সদস্যেরও দেখা নেই। আমার দুশ্চিন্তা হল। তা হলে কি আমরা পথ ভুল করেছি?

অথবা ওরাই ভুল করে অন্যদিকে চলে গেল? কিন্তু তা কি করে সম্ভব। এই অঞ্চল তো ওদের অচেনা নয়!

ফুতার শেরিং লাকপা, সোনা আর গ্যালজেনকে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে আসতে বলল। খানিকক্ষণ পরে ওরা ফিরে এসে জানাল, দলনেতা দু'জন শেরপাকে পাঠিয়েছেন। নন্দাখরকে তাঁবু পড়েছে। অতএব আমাদেরও এখনই ওখানে ফিরে যেতে হবে।

আমরা ফিরে চলি। দূরে দু'টি কালো বিন্দু নজরে পড়ে। আমরা সেদিকে এগিয়ে চলি। রাস্তা বিশেষ ভাল নয়। ক্রমেই কালো বিন্দু দু'টি বড় হচ্ছে।

কাছে আসতেই নজরে পড়ল বিশ্বদেবদাকে। সঙ্গে নারায়ণ। গরম চা ও বিস্কুট নিয়ে এসেছেন। আর নিয়ে এসেছেন ডালের স্যুপ। প্রচণ্ড খিদেও পেয়েছিল। পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে আমরা তার সদ্ব্যবহার করি। তারপর প্রায় ছুটে ছুটেই বাকি পথটুকু পাড়ি দিয়ে নন্দাখরকে পৌঁছাই।

৩০শে আগস্ট, ১৯৬৬।

অবশেষে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আমরা বেসক্যাম্প বা মূল-শিবিরে পৌঁছলাম। পূর্বি কামেট হিমবাহ ও রাইকানা হিমবাহের সংযোগস্থলের প্রান্তিক গ্রাবরেখার উপর এ স্থানের নাম বসু-ধারাতাল। সমুদ্রতল থেকে ১৫,৭০০ ফুট উঁচু। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে মানা আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তারই গা ঘেঁষে রয়েছে আরো দু'টি শৃঙ্গ—একটি নামবিহীন, অপরটি দেওবন। মানার দৃশ্য চোখ জুড়ানো। মুহূর্তের মধ্যে দীর্ঘপথ অতিক্রমের কষ্ট দূর হয়ে যায় দেহ ও মন থেকে। মানা সত্যই সুন্দরী—হয়তো বা ভয়ঙ্করীও। কিন্তু তাতে কি এসে যাচ্ছে! ভয়ঙ্কর-সুন্দরের আকর্ষণেই তো হিমালয়ে আসা।

১৯৬১ সালেও এখানেই মূলশিবির স্থাপিত হয়েছিল। দীর্ঘ

সময়ের ব্যবধানে আজও তার কিছু কিছু নিদর্শন রয়েছে দেখলাম। বেশ কিছু জুনিপারের জ্বালানিকাঠ, টিনের কৌটো, ওষুধের শিশি, প্যাকিং বাক্স ইত্যাদি পড়ে রয়েছে। এক পাশে দুটো প্রকাণ্ড পাথরের ফাঁকে একটি বিস্কুটের টিনের মধ্যে কিছু খবরের কাগজ পাওয়া গেল। সময়ের ব্যবধানে কিছুটা ফ্যাকাশে হয়ে গেলেও কাগজগুলি পড়তে কোনই অসুবিধা হল না। উলটে-পালটে দেখতেই নজরে পড়ল প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীগৌরকিশোর ঘোষের লেখা মানার রিপোর্ট—সুন্দরী-মানা ভয়ঙ্করী-মানা।

নৌকোর পাটাতনের মত আমাদের এই মূল শিবিরের স্থানটি মুহূর্তের মধ্যে জমজমাট হয়ে উঠল। পর পর বেশ কয়েকটি তাঁবু লাগিয়ে দেওয়া হল। অদূরে একটি বিরাট পাথরের ধারে ত্রিপল টাঙিয়ে তৈরি হল কিচেন। আর এক পাশে স্টোর। যাবতীয় রসদ ও সাজসরঞ্জাম এই স্টোরেই থাকবে।

কিচেনের পেছনেই একটি ছোট্ট গ্লেসিয়ার পুল। সকালের দিকে এর জল জমে বরফ হয়ে গেলেও কোন অসুবিধা হবে না। প্রয়োজন মত যখন খুশি জল আনা যাবে। খানিকটা নিচেই রয়েছে জুনিপারের ঝোপ। যথেষ্ট জ্বালানী কাঠ রয়েছে সেখানে। মূলশিবিরের আদর্শ স্থান।

একে একে সকলেই এসে হাজির হল মূলশিবিরে। ঢং ঢং শব্দে ঘোড়া আর খচ্চরের দল এসে পৌঁছল পিঠে বোঝা নিয়ে। ঠিক তার পিছনে পিছনে এল কুলী আর লকুল, সঙ্গে তাদের বারোটি ভেড়া। ভেড়াগুলো মাঝে মাঝেই ব্যাঁ ব্যাঁ চিৎকার করছে।

হঠাৎ এমন সময় দূরে নজরে পড়ল কে যেন উর্ধশ্বাসে পড়িমরি করে মোরেনের উপর দিয়ে ছুটে আসছে। তার পেছনে একটি ঝব্বু। বোধ হয় তাড়া করেছে।

তাই দেখে সকলে হৈ হৈ করে উঠল। কয়েকজন তুষারগাঁইতি হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল সেদিকে। উল্টো দিক থেকে তাড়া

খেতেই ঝব্বু বিপদ বুঝে নিচে নেমে গেল। কোনরকম দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পেল তাড়া খাওয়া মানুষটি।

কাছে আসতেই দেখি মানুষটি আর কেউ নয়—আমাদের ধ্রুবদা। প্রচণ্ড হাঁপাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি তার পিঠ থেকে রুকস্যাক খুলে নেওয়া হল। বিশ্বদেবদা, নিমাইদাও ঠিক তার পেছনেই এলেন। চা আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ছুপ্পে তাড়াতাড়ি মগ ভর্তি করে তাদের চা দেয়। গরম চা-এর মগে চুমুক দিয়ে ধ্রুবদা হাঁফ ছেড়ে বলেন—উঃ।

নিমাইদার মুখেই শুনলাম সমস্ত ঘটনাটা। ওঁরা একসঙ্গেই সকলে আসছিলেন। ঝব্বুগুলো ওদের সামনে-পেছনে চলছিল। হঠাৎ একটা সংকীর্ণ জায়গায় পৌঁছুতেই ধ্রুবদা ঝব্বুটাকে পাশ কাটিয়ে আসবার চেষ্টা করতেই এই বিপত্তি ঘটে। আসলে ঝব্বুটাই ভয় পেয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করে দেয়। নিমাইদা বলেন—ধ্রুব যদি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকত, তা হলে হয়তো ঝব্বুটা কিছুই করত না।—হ, হালায় ওরে তুমি চিন না। দাঁড়াইয়া থাকলে ও বেটা আমারে শ্যাষ্ কইর‍্যা দিত।

ধ্রুবদার কথা শুনে আমরা সকলে হো হো করে হেসে উঠি। নিমাইদা যেন তার কিছুই শুনতে পান না। গম্ভীর গলায় তিনি বিশ্বদেবদাকে জিজ্ঞেস করেন—বিশ্বদেব, ঘোড়া-খচ্চর-ঝব্বুওলাদের কি আজই পেমেণ্ট করে ছেড়ে দেবে নাকি?

—না নিমাইদা, আজকে নয়, আগামীকাল ছাড়ব ওদের। তা ছাড়া আজ ওদের এখানে টাকা-পয়সা দিয়ে ছেড়ে দিলে ওরা যাবেই বা কোথায়? সন্ধ্যের আগে সেপুকেও পৌঁছুতে পারবে না।

—না, তা তো ঠিকই। নিমাইদা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলেন, —তা, সব ঝব্বুগুলোই কি ছেড়ে দেবে?

—তা-ই তো কথা হয়েছে ওদের সঙ্গে। বেসক্যাম্পে মাল ফেলে ওরা ফিরে যাবে।

—উপরে দু'চারটে নিয়ে যাবে না? নিমাইদা একমুখ ধোঁয়া ছাড়েন।

—না। মাল বইবার জন্য তো কুলীই থাকছে, বিশ্বদেবদা নিমাইদার দিকে তাকিয়ে থাকেন একদৃষ্টে।

—আমি বলছিলাম কি, ঝব্বু অন্ততঃ একটা রেখে দাও বিশ্বদেব, নিমাইদা গম্ভীর গলায় বলেন।

—কিন্তু···বিশ্বদেবদা কিছুই বুঝতে না পেরে নিমাইদার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন।

নিমাইদা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বিশ্বদেবদার সামনে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসেন—তুমি কি এ যাত্রায় পিক্ ক্লাইম্ব করতে চাও?

—নিশ্চয়ই, তাতে কি কারুর আবার আপত্তি আছে নাকি? বিশ্বদেবদা মাথা দুলিয়ে বলে ওঠেন।

—তা হলে ঝব্বু একটা অন্ততঃ রাখো।

—ব্যাটা, তর কি মাথাটাথা খারাপ হইল নাকি? কি যা-তা কইতে আছস? ধ্রুবদা রেগে গিয়ে নিমাইদার সামনে গিয়ে দাঁড়ান।

কিন্তু নিমাইদাকে অত্যন্ত নির্বিকার নিশ্চিন্ত দেখাল। ধীর-স্থির অথচ শান্ত গলায় তিনি বিশ্বদেবদাকে বলেন—আজকেই আমার মাথায় প্ল্যানটা এসেছে। পিক্ যদি ক্লাইম্ব করতে চাও, তা হলে ধ্রুবকে আগে দিয়ে পেছনে একটা ঝব্বু ছেড়ে দিতে হবে। দেখবে আমরা সাকসেসফুল হবই। ব্যাড ওয়েদার, টেকনিক্যাল ডিফিক্যালটিস কোন কিছুই আমাদের পথ রোধ করতে পারবে না। সুতরাং একটা ঝব্বু অন্ততঃ রেখে দিও বিশ্বদেব! নাটকীয় ভঙ্গিতে শেষ করলেন নিমাইদা।

এবারে সমস্ত ব্যাপারটা আমাদের বোধগম্য হয়। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়। এমনকি ধ্রুবদাও না হেসে থাকতে

পারেন না। খানিকক্ষণ পরে তিনি কৃত্রিম রাগের ভান করে নিমাইদাকে বলেন—হালা, ফাইজলামির আর জায়গা পাও না? শ্বশুরের গুঁতা তো খাও নাই, বুঝবা ক্যামনে?

॥ ছয় ॥

সারাদিন খাটতে হল। মালপত্র রিপ্যাকিং, ইক্যুইপমেন্ট গোছ-গাছ করতে করতেই বিকেল গড়িয়ে এল। আগামীকাল এক নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা হবে। তার জন্য প্রয়োজনীয় রেশন ও সাজ-সরঞ্জাম আলাদা করে রাখা হল, যাতে শেরপা ও কুলীরা সকাল সকাল রওনা হয়ে যেতে পারে।

ম্যানেজার শিবশঙ্করদাকে আজ খুবই বিপন্ন মনে হচ্ছে। তিনি কখনও কিচেনে ঢুকছেন আবার কখনও বা স্টোরে গিয়ে খাবার-দাবারের খোঁজাখুঁজি করছেন। পাচক ছুপ্পে কিন্তু তবু তাঁর পেছনে লেগে রয়েছে। সুযোগ পেলেই বলছে—ম্যান্‌জার সাব, রাত কা লিয়ে কৌন্ সা খানা পাকায়েগা? সাব মিরচা কিধার? অরলিস (হরলিকস) কা ডিব্বা ভি এক ঠো চাহিয়ে। নানা প্রশ্নে জর্জরিত করছে তাঁকে। শিবশঙ্করদা থই পাচ্ছেন না।

কেবল ছুপ্পে নয়, সদস্যদেরও নানা ফরমাশ রয়েছে ম্যানেজারের কাছে। কেউ বলছেন—শিবু, একটু চা তৈরি করে পাঠিয়ে দে তো! কেউ বলছেন—শিবু, পারিস যদি একটু কফি পাঠিয়ে দে। কেউ বলছেন—চায়ের সঙ্গে একটু তেলেভাজা হলে তোফা হত, বুঝলি শিবু। আবার কেউ বা বলছেন—কালকের মত একটু হালুয়া তৈরি কর না ভাই শিবু! শুধু শিবু, শিবু আর শিবু।

শিবশঙ্করদা অন্ধকারে বাক্স হাতড়াতে হাতড়াতে বলে ওঠেন—হালুয়া তো বাবা আমার টাইট হয়ে গেছে! আমাকে খেয়ে নাও এবার। যত সব রাক্ষসগুলো একসপিডিশনে এসেছে।

দশ-বারো জন থাকার উপযোগী বড় Mess Tent-এর সামনে এসে দেখি কুলীরাও শিবশঙ্করদার জন্যই অপেক্ষা করছে। রাত হয়ে আসছে, এখনও তারা রেশন পায় নি। সকলেই বেশ অধৈর্য হয়ে পড়েছে।

বিশ্বদেবদা, নারায়ণ আর সুজন ছুটে আসে। শেরপা সর্দার লাকপা আর সোনাকে নিয়ে তারা স্টোর থেকে চাল, ডাল, আটার বস্তা টেনে বাইরে বের করে। নিয়ে আসে চা, চিনি, দুধ, আলু, পেঁয়াজ, শুকনো লঙ্কা ইত্যাদি। তারপর লাইনবন্দী কুলীদের একে একে রেশন দেয়।

রাত তখন প্রায় আটটা। বসুধারাতালের আশেপাশে এখানে ওখানে কুলীরা আগুন জ্বালিয়ে রাতের খাবার তৈরি করছে। সকলেরই মেজাজ বেশ সুপ্রসন্ন। সমবেত কণ্ঠে গান গাইছে তারা।

দলনেতার নির্দেশে আমরা Mess Tent-এ আসি। আসে শেরপারাও। আগামী দিনের কর্মসূচী ঘোষণা করবেন দলনেতা।

তাঁবুর মাঝামাঝি একটি প্যাকিং বাক্স। তার উপরে ডে-লাইট। আমরা আলোর চারিদিকে গোল হয়ে এয়ার-ম্যাটট্রেসের উপর বসে আছি। বিশ্বদেবদা বলতে শুরু করেন—নানা কারণে ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের নির্দিষ্ট কর্মসূচী থেকে চারদিন পিছিয়ে পড়েছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব, যে-সমস্ত বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে আজ আমরা এখানে পৌঁছেছি, তার কোন তুলনা নেই। দলের সমবেত আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্যই তা কেবল সম্ভব হয়েছে।

কথা ছিল মূলশিবিরে পৌঁছে আমরা দু'দিন পূর্ণ বিশ্রাম নোব এবং শিবির ভিত্তিক সমস্ত মালপত্র গোছগাছ করব। কিন্তু এখন তা আর সম্ভব হয়ে উঠছে না। আগামীকাল থেকেই আমাদের পরবর্তী শিবির স্থাপনের কাজ শুরু করতে হবে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এই মূলশিবিরেও মালপত্র প্যাকিং-এর কাজও চলবে। অর্থাৎ দুটো কাজই এক সঙ্গে চলবে, অযথা সময় নষ্ট করব না।

এই বলে বিশ্বদেবদা একটু থামলেন। তারপর পাসাং শেরিংকে ইশারা করে ডেলাইট-এ পাম্প দেবার নির্দেশ দিয়ে পুনরায় তিনি বলতে শুরু করেন—এক নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব আমি প্রদ্যোৎকে দিচ্ছি। এই বলে তিনি প্রদ্যোৎদার দিকে তাকিয়ে বলেন—প্রদ্যোৎ, একষট্টি সালে আমরা যেখানে তাঁবু লাগিয়েছিলাম, সেইখানেই এবারও তাঁবু লাগবে। তুই জায়গাটা খুঁজে বের করে নিবি। তোর সঙ্গে থাকবে নারায়ণ। তোদের প্রয়োজনীয় খাবার দাবার এবং সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে দেওয়া হবে। বলেই বিশ্বদেবদা আমাকে প্রশ্ন করেন—প্রাণেশ, ওদের সঙ্গে কাল যেসব মালপত্র যাবে তা রেডি তো?

—হাঁ।

—তার জন্য কতজন কুলী লাগবে?

—বারো।

—বেশ। তা হলে প্রদ্যোৎ, আগামীকাল তোমাদের সঙ্গে বারো জন কুলী যাবে মালপত্র নিয়ে। আর যাবে দু'জন শেরপা।

—কে কে? প্রদ্যোৎদা জানতে চান।

সহনেতা নিমাইদা পাশেই বসেছিলেন। বিশ্বদেবদা তাঁর সঙ্গে কি যেন আলোচনা করেন। তারপর বলেন—তোমাদের সঙ্গে যাবে পাসাং ফুতার আর ছুঞ্জে। পাসাং ফুতার? বিশ্বদেবদা হাঁক দেন।

—জী সাব! ফুতার সোজা হয়ে বসে।

—তুম্ আউর ছুঞ্জে দোনো কাল প্রদ্যোৎ সাবকা সাথ্ উপর যায়েগা।

—ঠিক্ হ্যায় সাব।

এই সময় টর্চ হাতে শিবশঙ্করদা তাঁবুর মধ্যে ঢোকেন। তাঁর হাতে এক থালা পাঁপড় ভাজা। পিছনে ছুঞ্জে। তার হাতে একটা বড় কেত্‌লি এবং গোটাকতক মগ। শিবশঙ্করদা নিঃশব্দে চা আর পাঁপড় ভাজা বিতরণ করে চলে যান। বিশ্বদেবদা মগে চুমুক দিয়ে

আবার শুরু করেন—প্রত্যোৎ, একটা কথা মনে রাখিস, তোদের সঙ্গে যে বারোজন কুলী যাবে, তাদের কাছ থেকে মালপত্র বুঝে নিয়ে সকলকেই কিন্তু এখানে ফেরত পাঠিয়ে দিবি।

—ঠিক আছে।

—পরের দিন অর্থাৎ পয়লা তারিখ তোরা আবার দু'নম্বর শিবিরের জায়গা নির্বাচন করে এক নম্বর শিবিরে ফিরে আসবি। দু'নম্বর শিবিরও একষট্টি সালের জায়গাতেই করবার চেষ্টা করবি।

পয়লা তারিখ এখান থেকে মদন এবং সুজন এক নম্বরে যাবে। সে রাত সেখানে থেকে দু'তারিখে ওরা দু'নম্বর শিবিরের দখল নেবে, আর তোরা সেদিন এক নম্বর শিবিরে বিশ্রাম নিবি।

আপাততঃ মোটামুটিভাবে এই হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রাম। এর পরে কি হবে না হবে আমি তা পরে জানিয়ে দোব।

এবারে বিশ্বদেবদা মদনদা, শেরপা সর্দার লাকপা ও পাশাং ফুতারকে নিয়ে আলোচনায় বসলেন। কাল কোন কোন কুলীকে উপরে পাঠানো হবে তার একটা তালিকা প্রস্তুত করলেন। সেই সঙ্গে নেতা সিদ্ধান্ত নিলেন কয়েকজন ছাড়া বাকি সমস্ত কুলীকে নিচে নন্দাখরকে জুনিপারের জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে আনতে পাঠাবেন। কেননা প্রতিদিন এতগুলো মানুষের রান্নাবান্না করার জন্য বিস্তর কাঠের প্রয়োজন। দীর্ঘ একমাস যদি আমাদের এখানে থাকতে হয় তা হলে এখন থেকেই সেই কাঠ মজুত করতে হবে। তা নইলে শুধুমাত্র কেরোসিনের উপর নির্ভর করা যুক্তিযুক্ত হবে না। কেরোসিন যা সঙ্গে আনা হয়েছে, তা কেবল উপরের শিবিরগুলোর জন্যই বরাদ্দ করে আনা হয়েছে। বরফের উপরে জ্বালানী হিসেবে কেরোসিন ছাড়া আর অন্য কিছু ব্যবহার করা সম্ভব হবে না।

বেশ রাত হয়েছে। কুলীরা খাওয়া-দাওয়া সেরে কিছু ত্রিপলের ছাউনির নিচে, কিছু তাঁবুর ভেতর ঢুকে পড়েছে। বাইরে হু হু শব্দে বাতাস বইছে। আমাদের খাওয়ার এখনও দেরি আছে। নিমাইদা

স্লিপিং-ব্যাগের ভেতর ঢুকে গান ধরেন—ঝুমকা গিরা রে, বম্বুধারা কী বাজার মে···। দীপক ঢোল নিয়ে সঙ্গত করছে।

আসর বেশ জমে উঠেছে। নিমাইদার সুরেলা কণ্ঠ আর দীপকের মিষ্টি হাতের গুণে আমরা স্থান, কাল, পাত্র ভুলে গিয়ে সুরের মায়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। হঠাৎ তাঁবুর বাইরে উৎকণ্ঠিত আহ্বান—ডগ্‌দর সাব?

—কৌন? দীপক বাজনা থানায়।

—ম্যায় অবতার সিং।

—ক্যায়া হুয়া, অন্দর আও।

অবতার সিং তাঁবুর ভেতরে ঢোকে। তার সর্বাঙ্গ কম্বলে আবৃত। শুধু তার চোখ আর গোঁফ জোড়া দেখা যাচ্ছে। কাঁদো কাঁদো গলায় সে বলে—ডগ্‌দর সাব, বহুত শির দরদ। উল্‌টি ভী আতা হ্যায় বহুত। দাওয়াই দিজিয়ে, নহী তো হম্‌ মর যায়েগা।

অবতার সিং-এর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকজন কুলী এসে হাজির হয় তাঁবুতে। তাদেরও ওই একই বক্তব্য—ঘুম হচ্ছে না, মাথা ঘুরছে। গা বমি বমি করছে।

আসলে এ সবই নিচ থেকে উপরে উঠে আসার জন্য হয়েছে। সাধারণতঃ দশ হাজার ফুটের উপরে এ ধরনের রোগ দেখা দেয়। ডাক্তারীশাস্ত্রে একে বলে হাই অলটিচুড সিকনেস বা উচ্চতাজনিত পীড়া। অক্সিজেনের স্বল্পতা, মাত্রাতিরিক্ত ঠাণ্ডা, প্রভূত পরিশ্রম ইত্যাদি থেকেই এই রোগগুলি দেখা দেয়। কেউ কেউ একই উচ্চতায় দু'তিন রাত বাস করেও এর কবল থেকে অব্যাহতি পায় না। সেজন্য ধীরে ধীরে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে উঠতে পারলে ভাল হয়। তা হলে আর এজাতীয় রোগের কোন ভয় থাকে না। পর্বতারোহণে এই খাপ খাইয়ে নেওয়াকে বলে—'অ্যাকলেমেটাইজেশন'।

কালবিলম্ব না করে দীপক ঢোলখানা পাশে রেখে উঠে দাঁড়ায়।

তারপর সে সবাইকে ডেকে নিয়ে তাঁবুর এক কোণে গিয়ে বসে। জিজ্ঞাসাবাদ করে একে একে, কার কী হয়েছে জেনে নিয়ে ওষুধ দেয়।

দীপকের এই কর্তব্যনিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হই। এত উঁচুতে উঠে এসেও সে তার কর্তব্য সম্পর্কে সর্বদা সজাগ। প্রবল ঠাণ্ডার মধ্যে যেখানে স্লিপিং-ব্যাগ থেকে বেরুতে ইচ্ছে করে না, সেখানে সে কিনা এক কথায় বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। কোন ক্লান্তি বা বিরক্তির চিহ্ন দেখতে পেলুম না তার চোখেমুখে। অথচ যোশীমঠে পৌঁছুনোর পর থেকে চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাকে এত বেশি ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে যে, সে ফুরসৎই পাচ্ছে না বসার। একটার পর একটা লেগেই আছে। এমনকি রাস্তায় চলতে চলতেও তাকে চিকিৎসা করতে দেখেছি, দেখেছি ওষুধ দিতে।

এই সুন্দর স্বভাবের জন্যই বোধ করি ডগদর দীপক সিন্‌হা কুলীদের মধ্যে অত্যন্ত প্রিয়। তার কোন অসুবিধা হয়েছে কি অমনি কুলীরা সকলেই ছুটে আসবে তাকে সাহায্য করতে। অনেককে বলতে শুনেছি, ডগদর সাহেবকে সুস্থ রাখতে না পাবলে আমরা সুস্থ থাকব কি করে।

দীর্ঘাঙ্গী, সুঠাম দেহের অধিকারী দীপক জীবনে এর আগে পর্বতাভিযান তো দূরের কথা, পাহাড় পর্যন্ত চোখে দেখে নি। অসাধারণ তার মনের জোর। আর তাই সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই এই অভিযানে যোগ দিয়েছে।

বসুধারাতাল। গাঢ় নীল আকাশ অসংখ্য ঢাকা পাহাড়-চূড়া সেই আকাশ স্পর্শ করে। রাশি রাশি শাদা মেঘের পুঞ্জ ধীরে ধীরে তারই গা বেয়ে উঠে অদৃশ্য হয়ে যায়। দেখতে পাই মানার গর্বোন্নত শির। তাতে সূর্যের রক্তিম আভা পড়েছে।

সামনেই একটি প্রকাণ্ড হ্রদ। নীলাভ তার জল। চড়ুই পাখির

মত ছোট্ট ছোট্ট এক ঝাঁক পাখি সেই জলে অবগাহন করছে। কিচির মিচির শব্দে তারা মুখর করে তুলেছে সারা বসুধারাতাল।

অদূরে পূর্ব-দিকের গিরিপ্রাচীরের মাথা থেকে নেমেছে একটি ঝর্ণা। রামধনু রঙ সেই ঝর্ণাধারা সশব্দে এসে মিশেছে হ্রদে। তারই দুপাশে কত না ফুল—Saxifrages, Androsaces, Lettuce ইত্যাদি।

উত্তর-পশ্চিম দিকে নজর পড়তেই দেখি প্রত্যোৎদারা বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছেন। এখান থেকে কালো বিন্দুর মত দেখাচ্ছে তাঁদের। সমুদ্র তরঙ্গে ভাসমান নৌকোর মত পূর্বি-কামেট হিমবাহের প্রস্তর স্তূপের মধ্যে তারা কখনও ভেসে উঠছেন আবার কখনও বা ডুবে যাচ্ছেন।

পরের দিন মদনদা এবং সুজন চল্লিশ জন কুলী ও নকুল নিয়ে এক নম্বর শিবিরের পথে রওনা হয়ে গেলেন।

ছু' তারিখে বিশ্বদেবদা, নিমাইদা, তাপসদা এবং আমি মূল শিবির ছেড়ে উপরের দিকে রওনা হলাম, যাত্রাক্ষণে ধ্রুবদা হাত চেপে ধরে বললেন—ডোণ্ট টেক্ এ্যানি রিস্ক। তারপর চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে বিশ্বদেবদাকে বললেন—অইখানে গিয়াই কুলীগো হাত দিয়া চিডি পাডাইস।

—আচ্ছা। নিমাইদা বলেন।

—সাবধানে থাকিস তোরা, ছলছল চোখে শিবশঙ্করদা বলেন।

—তোরাও থাকিস, বিশ্বদেবদা পিঠে রুক্স্যাক তুলতে তুলতে বলেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে এগিয়ে যান সামনের দিকে। আমরা সকলে তাঁকে অনুসরণ করি।

পেছন থেকে ভেসে আসে দিলীপদার কণ্ঠস্বর—উইশ ইয়োর গুড লাক্।

আমরা ধীরে ধীরে বসুধারাতাল পেরিয়ে পূর্বি-কামেট ও রাইকানা

হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখার উপর নেমে এলাম। পেছন ফিরে একবার তাকাই। ওরা তিনজনে এখনও দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে।

এখানে পথ বলতে কিছু নেই। রাইকানা হিমবাহকে উত্তর-পূর্বে রেখে আমরা পুর্বি-কামেট হিমবাহের উপর দিয়ে এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলেছি। সামনে যতদূর দৃষ্টি পড়ে, কেবল নানা আকারের পাথর আর পাথর। হিমবাহের বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। দেখে মনে হয় যেন যুদ্ধে বিধ্বস্ত কোন শহর।

এই রকম পাথরের উপর দিয়ে পথ-চলা রীতিমত কষ্টকর।

অতিকায় হলেও অধিকাংশ পাথরের উপরেই পা রাখার জো নেই। পা রাখতেই প্রচণ্ড বেগে হুড়মুড় শব্দে গড়িয়ে পড়ছে। বেড়ালের মত আলতো করে পা ফেলে অতি সন্তর্পণে এগুতে হচ্ছে আমাদের।

মাঝে মাঝেই দমকা বাতাস বইছে। তাতে আশেপাশের গিরিগাত্র থেকে সশব্দে পাথর গড়িয়ে পড়ছে। আমরা প্রান্তিক গ্রাবরেখা ছেড়ে মধ্য-গ্রাবরেখায় উঠে এসেছি।

অসংখ্য ফুল ফুটে আছে এখানে। ছোট্ট ছোট্ট হলুদ Androsaces এবং Saxifrages ছাড়াও অনেক জয়েগাতেই নজরে পড়ল উলের মত নরম Saussurea ইত্যাদি। সদ্য শিশিরস্নাত। এত উঁচুতে নীরস পাথরের বুকে প্রাণের স্পন্দন দেখে আমার সব শ্রান্তি ও ক্লান্তি নিমেষে দূর হয়ে যায়। মন ভরে ওঠে এক অনির্বচনীয় আনন্দে।

হিমবাহের উপরিভাগের পাথরের নিচেই রয়েছে শক্ত বরফের আচ্ছাদন। কিন্তু মাটি আর পাথরের সংমিশ্রনে তার রং কালো হয়ে গেছে।

ক্রমাগত লাফিয়ে লাফিয়ে এক নাগাড়ে বেশীক্ষণ চলা যায় না। তাই মাঝে মাঝে জিরিয়ে নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। কুলীরা খুবই পরিশ্রান্ত। পিঠে বোঝা নিয়ে তারা চড়াই-উৎরাই ভাঙতে অভ্যস্ত ঠিকই কিন্তু এ ধরণের পথে তাদের চলার অভ্যাস নেই বললেই চলে। তারা ইতিমধ্যেই বেশ হাঁপিয়ে উঠেছে। তাপসদা এগিয়ে

গিয়ে তাদের পিঠ চাপড়িয়ে বাহবা দেন। বলেন—সাবাস মেরে ইয়ার। তারপর পকেট থেকে লজেন্স বের করে হাতে দেন। কুলীরা খুশি হয়। তারা আবার পথ চলতে শুরু করে।

হঠাৎ একজায়গায় নজরে পড়ল পূর্বি-কামেট হিমবাহের উত্তর-তীরে একটি সরু পায়ে চলা পথ। এঁকে বেঁকে সেই পথটি কখনও কখনও হিমবাহের একেবারে পার্শ্ব-গ্রাবরেখার ধার দিয়ে চলে গেছে। তারই পাশে পাশে কিছুদূর অন্তর অন্তর বরফগলা জলের ছোট ছোট হ্রদ। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের চাঁই ভাসছে তাতে। মনোমুগ্ধকর দৃশ্য।

নিমাইদা বলেন—ওটা বোধহয় ভেড়াওয়ালাদের পথ। উপরে নিশ্চয় কোথাও না কোথাও তৃণভূমি আছে।

ভেবে চলি ভেড়াওয়ালাদের কথা। সত্যি বিচিত্র এই মেষ-পালকের দল। হিমালয়ের কত উঁচুতে যে এরা ভেড়া নিয়ে যাতায়াত করে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। শুধু তাই নয়, হিমালয়ের গহন-কন্দরের অধিকাংশ পথগুলোই মেষপালকদের আবিষ্কার।

ঘণ্টা চারেকের প্রভূত পরিশ্রমে আমরা এক নম্বর (১৭,১০০´) শিবিরে পৌছুলাম। সেখানে নারায়ণ এবং প্রদ্যোৎদা ছিলেন। তাঁরা গতকাল দু'নম্বর শিবিরের স্থান দেখে এসেছিলেন। আজ সকালে সুজন এবং মদনদা পাসাং ফুতারকে নিয়ে সেখানে চলে গেছেন। আগামী কাল তাঁরা ওখান থেকে তু'নম্বর শিবিরের স্থান নির্বাচন করবেন।

এক নম্বর শিবিরের এই সংকীর্ণ স্থানটির দু'দিকে গিরিপ্রাচীর। তারই মধ্য দিয়া সর্বদা ঝড়ের বেগে ঠাণ্ডা শুকনো বাতাস বইছে। ফলে গিরিগাত্র থেকে সশব্দে অবিশ্রান্ত পাথর পড়ছে হিমবাহের উপর। তার শব্দে এখানে কান পাতা দায়। তার উপরে রয়েছে ধূলিঝঞ্ঝা। সেজন্য এখানে চোখ-মুখ খুলে বেশীক্ষণ তাঁবুর বাইরে থাকা যায় না।

১৯৫৫ সালে মেজর এন. ডি. জয়াল কামেট অভিযানের সময় এখানেই শিবির স্থাপন করেছিলেন। কিছু কিছু পুরনো টিনের বাক্স, শিশি বোতল ইত্যাদি পাওয়া গেছে। আর পাওয়া গেছে একষট্টি সালের মানা অভিযানে ব্যবহৃত জিনিষপত্র। প্রত্যোৎদারা সেগুলো আমাদের দেখালেন। লাল ডিমার্কেশন ফ্ল্যাগটিই তার মধ্যে অন্যতম। দীর্ঘদিন রোদ আর বরফে তার রং কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। পাথর ও বাতাসের আঘাতে শতছিন্ন।

খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর কুলীরা মূল শিবিরে নেমে গেল। আমরা লকুলদের নিয়ে তাঁবু ফেললাম। তারপরে মালপত্র গোছ-গাছ শুরু করি। আর ছুঞ্জেকে নিয়ে প্রত্যোৎদা গেলেন কিচেনে। কারণ সন্ধ্যার পরেই খাওয়া-দাওয়ার পাট সেরে ফেলতে হবে।

সন্ধ্যেবেলায় শেরপা আর লকুলদের মধ্যে হঠাৎ দারুণ চাঞ্চল্য দেখা দিল। চীৎকার করে নেপালী ভাষায় তারা কি যেন বলাবলি করছে। ছুঞ্জে একটা বড় পাথরের আড়ালে বসে ভেড়ার মাংস কাটছিল। সোরগোল শুনে সে মাংস ফেলে ভোজালি-হাতে ছুটে গেল। তার হাতে জামা-কাপড়ে তখনও রক্তের দাগ।

আমরাও তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসি। কিন্তু ব্যাপারটা কি ঘটেছে কিছুই বুঝতে পারি না। শেরপাদের সে-কথা জিজ্ঞেস করতেই তারা মুখ কাঁচুমাচু করে জানাল ছুটো ভেড়া কোথায় পালিয়ে গেছে। অথচ একটু আগেও যখন ছুঞ্জে ভেড়া কাটছিল, তখন ওরা এখানেই ছিল। কোন ফাঁকে পালিয়ে গেছে কেউ দেখতে পায় নি।

খোঁজ খোঁজ খোঁজ। শেরপা আর লকুলের দল টর্চ্চ নিয়ে গ্রাবরেখার আশেপাশে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লেগে গেল। কিন্তু ওরা নিরুদ্দেশ। এমন সময় হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে উঠল—ওই যে -যাচ্ছে।

আবছা অন্ধকারে দেখা গেল দূরে গিরিশিরা বেয়ে ভেড়া ছুটো

ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। শেরপারা কাল বিলম্ব না করে চড়াই উৎরাই ভেঙে ছুটল।

আজ মূল শিবির থেকে আসবার সময় আমরা গোটা চারেক ভেড়া নিয়ে এসেছি।' বোধ করি চোখের সামনে সঙ্গীর ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখে ভেড়া দুটো ভয় পেয়ে থাকবে। তাই প্রাণের তাগিদে রাতের অন্ধকারে সুযোগ বুঝে পালিয়ে গেছে।

শেরপারা বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এল শিবিরে। গিরিগাত্রে ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা কি সোজা কথা? শেরপারা এক পা এগোয় তো ভেড়া দুটি পাঁচ হাত এগিয়ে যায়।

পরের দিন নিচের শিবির থেকে খবর পাওয়া গেল গতকালই গভীর রাতে ভেড়া দুটি মূল শিবিরে পৌঁছে গেছে। অন্যান্য সঙ্গীদের দেখা পেয়ে তারা বেশ সুখেই আছে সেখানে। আমরাও সুখী হই।

কিন্তু রাতের অন্ধকারে পথের হদিশ করে কি ভাবে ওরা মূল শিবিরে গিয়ে হাজির হল?

৩রা সেপ্টেম্বর। আজ শেরপা, লকুল ও কয়েকজন নেপালী কুলীর সঙ্গে গিয়ে দু'নম্বর শিবিরে রসদ ও সাজ-সরঞ্জাম মজুত করে ফিরে এলাম আমরা। নেতার নির্দেশ মত নারায়ণ সেখানে থেকে গেল। মদনদা নেমে এলেন আমাদের সঙ্গে। বিকেলের দিকে মূল শিবির থেকে দিলীপদা কুলীদের নিয়ে হাজির হলেন। পর্যাপ্ত খাদ্য সম্ভার ছাড়াও তিনি প্রচুর জ্বালানী কাঠ সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। পর্বতগাত্রে এই জ্বালানী কাঠের মূল্য অপরিসীম। কেননা ষ্টোভের সাহায্যে এই উচ্চতায় এতগুলো লোকের রান্না করার নানা ঝামেলা। কেবল কেরোসিনই খরচ হয় না, খাদ্যদ্রব্য তেমন সেদ্ধ হতেও চায় না। সময়ও লাগে অত্যন্ত বেশী। সবচেয়ে বড় কথা, আরো উঁচুতে বরফের উপর যেখানে কাঠ নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না, সেখানে এই বাঁচানো কেরোসিন ভীষণ কাজে লাগবে। তাই এখন থেকেই কেরোসিন সাশ্রয় করতে হবে আমাদের। আমরা নিচের শিবিরগুলিতে কাঠ দিয়ে রান্না করব।

॥ সাত ॥

৪ঠা সেপ্টেম্বর।

গুড মর্ণিং বড়া সাব, গুড মর্ণিং প্রাণেশ সাব।

চোখ মেলে চেন খুলে তাঁবুর ছোট্ট দরজা দিয়ে উঁকি দিতেই দেখি সোনা দাঁড়িয়ে আছে। তার আপাদমস্তক খয়েরী রঙের উইণ্ড প্রুফ প্যাণ্ট এবং জ্যাকেটে আবৃত। মাথায় বালাক্লাভা। কেবল মুখখানি দেখা যাচ্ছে। আমাকে দেখতে পেয়ে সোনা একগাল হেসে বলে—বেড টি সাব। তারপর কেত্‌লি থেকে গরম চা ঢেলে মগটা আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়। বিশ্বদেবদাও তার হাত থেকে চা নিয়ে জিজ্ঞেস করেন—সোনা, আবহাওয়া কেমন?

—খুব ভাল, বড়া সাব। একেবারে নীল আকাশ। ছিটে ফোঁটা মেঘও নেই কোথাও।

শুনে খুব আনন্দ হয়। উপুড় হয়ে শুয়ে দরজা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি মেলে ধরি। গরম চা-এর মগে চমুক দিতে দিতে উপভোগ করি সুন্দর সকাল। সত্যই সুন্দর।

কিন্তু দরজা দিয়ে মাথাটা বাইরে বের করতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস আছড়ে পড়ল চোখে-মুখে। সঙ্গে সঙ্গে যেন অবশ হয়ে এল আমার সারা শরীর।

এখুনি স্লিপিং ব্যাগ ছেড়ে উঠতে হবে ভেবে মনটা খারাপ্ হয়ে গেল। কিন্তু উপায় নেই। দলনেতার নির্দেশ। আজ আমরা এখান থেকে সরাসরি তিন নম্বর শিবিরে উঠে যাব। দীর্ঘ পথ। যত তাড়াতাড়ি বেরুতে পারব ততই সুবিধা হবে।

জুতো মোজা পরে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে বাইরে বেরিয়ে আসি। বেরিয়ে আসেন নিমাইদা, দিলীপদারাও।

দেখতে দেখতে এক নম্বর শিবিরে দারুণ প্রাণ চাঞ্চল্য দেখা দিল।

প্রাতঃরাশ সেরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যেও শেরপা মকুলের দল যে যার মালের বোঝা পিঠে তুলে নিল। চাল, ডাল, তেল, ঘি, নুন, চা, কফি, চিনি, দুধ, থেকে শুরু করে টিনের মাছ মাংস, ভেড়ার মাংস, জ্বালানি ইত্যাদি কিছুই বাদ পড়ল না। এমনকি ডে-লাইট, ষ্টোভ, সুচ-সুতোও সঙ্গে নিয়ে নেওয়া হল। কারণ জনপদ থেকে দূরে প্রকৃতির নির্জন পরিবেশে এ সমস্ত কিছুই অত্যাবশ্যকীয় ও মূল্যবান। এর কোনটির অভাব হলে আমাদের দুর্দশার অন্ত থাকবে না।

তাছাড়াও নানা দিক থেকে আমাদের এই অভিযানে তৃতীয় শিবিরের গুরুত্ব অপরিসীম। উনিশ হাজার ফুটেরও কিছু বেশী উঁচুতে অবস্থিত এই শিবির থেকেই প্রকৃতপক্ষে মানা ও কামেট আরোহণের জন্য কঠিন ও জটিল প্রাকৃতিক বাধা বিপত্তির মোকাবেলা করতে হবে। সেজন্য যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম, খাদ্যসম্ভার ও লোকবল দিয়ে সেই শিবিরটিকে একটি শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। এই শিবিরই অভিযাত্রীদের প্রকৃতির নানা প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করার মদত যোগাবে।

আকৃতি ও প্রকৃতিগত দিক থেকে পূর্বি-কামেট হিমবাহ যেমন বিশাল, তেমনি জটিল ও ভয়াবহ। পাথর এবং বরফের সংমিশ্রণে গঠিত। এর প্রান্তিক গ্রাবরেখার তলদেশ অনেক জায়গাতেই একেবারে ফাঁপা। সেখান দিয়ে কলকল শব্দে ফল্গুধারা বয়ে চলেছে। এ ছাড়া অসংখ্য ফুটিফাটা সারা হিমবাহ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তুষার গাঁইতি দিয়ে ঠুকে ঠুকে এক-পা এক-পা করে এগোতে হয়।

খানিকটা এগুবার পর লক্ষ্য করলাম প্রশস্ত হিমবাহ ক্রমশঃ সংকীর্ণতর হয়ে আসছে। দু'পাশের গিরিগাত্র আর বুঝি আমাদের পথ দেবে না। পিষে মেরে ফেলবে।

হিমবাহের উপরের অংশও রীতিমত জটিল। উত্তর-পশ্চিম দিকে যেখানে হিমবাহ বাঁক নিয়েছে, সেখানে অসংখ্য চোরাফাটল মরণ

ফাঁদ পেতে রেখেছে। আমরা সে পথ পরিহার করে হিমবাহের পার্শ্ব-গ্রাবরেখা ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই।

কখনও উঠে কখনও বা নেমে, হিমবাহ ধরে আমরা পথ চলছিলাম। কঠিন বরফের আস্তরণ। পা রাখা মুশকিল। অতি সন্তর্পণে তুষার গাঁইতিতে ভর দিয়ে দিয়ে এগুতে হচ্ছে। কুলী আর লকুলের দল পিঠের বোঝা নিয়ে কতবার যে পড়ে গেল তার ইয়ত্তা নেই।

হঠাৎ পেছন থেকে একটা প্রবল আর্তনাদ ভেসে এল—মর্ গিয়া।

মুহূর্তের মধ্যে আমরা সকলে পিছন ফিরে তাকাই। দেখি নিমা থানডুপ তার পিঠের রুকস্যাক নিয়ে একটি তুষার গহ্বরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। আকাশে হাত তুলে সে প্রাণপণ চীৎকার করছে।

ইচ্ছে থাকলেও আমরা কেউ ছুটে যেতে পারলাম না তার কাছে। পথ শ্রমে আমরা সকলেই কাতর। পিপাসায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় হিমবাহের এই বিপজ্জনক পথে ছুটে যাওয়া রীতিমত হিম্মতের দরকার। তা ছাড়া অক্সিজেনের স্বল্পতার দরুণ শ্বাস নিতেও ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল।

চোখের সামনে এ ভাবে একজন সঙ্গীকে অতলে তলিয়ে যেতে দেখে আমি ভয়ে আঁতকে উঠি। কী সাংঘাতিক দৃশ্য। পাঁচ সাত গজ দূরে একটা আস্ত মানুষ আস্তে আস্তে মৃত্যু-গহ্বরে ঢুকে যাচ্ছে। অথচ তাকে আমরা কেউই বাঁচাতে পারছি না। সকলেই কেমন যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে।

দিলীপদা ঘাড় থেকে মুভি-ক্যামেরা নামিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালেন। তিনি অস্ফুট স্বরে বলে ওঠেন—বেচারা।

এই সময় ত্রাণকর্তার মত ছুঙ্গে কোত্থেকে ছুটে এল। তারপর নিমেষের মধ্যে সে নিমা থনডুপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রবল শক্তি দিয়ে সে টেনে ধরল নিমার হাত। নিমা নির্ঘাৎ পতনের হাত থেকে সাময়িক অব্যহতি পেল। মুহূর্তে আমার ম্রিয়মাণ সঙ্গীরা যেন সম্বিত

ফিরে পেল, কোথা থেকে একটা অদৃশ্য শক্তি এসে ভর করল তাদের দেহ ও মনে। তারা ছুটে গেল ছুঙ্গের কাছে। সকলে গিয়ে নিমাকে তুষার ফাটল থেকে টেনে তুলল।

কয়েকটি মুহূর্ত কাটে। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে নিমা আবার এগিয়ে চলতে শুরু করে। আমরাও এগিয়ে যাই সামনে। অসংখ্য গ্লেসিয়ার টেবল-এর পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে আমরা অবশেষে দু'নম্বর শিবিরে (১৮,০০০ ফুট) এসে পৌঁছাই।

বাতাসের বেগ এখানে অপেক্ষাকৃত কম। পিঠ থেকে রুকস্যাক নামিয়ে আমরা বসে পড়ি। বিশ্রাম করি। বিশ্রম নেয় কুলীরাও। ছুঙ্গে কিন্তু তাড়াতাড়ি কিচেনে গিয়ে ষ্টোভ ধরিয়ে জল চাপিয়ে দেয়। পিপাসায় সকলেই কাতর। একটু বাদে ছুঙ্গে গরম জল নিয়ে আসে। পান করে আমরা একটু ধাতস্থ হই। তারপর সে সকলকে গরম কফি পরিবেশন করে। কফি খেয়ে নতুন উদ্যমে আমরা তিন নম্বর শিবিরের দিকে রওনা হই।

কয়েকটি পদক্ষেপ মাত্র এগিয়েছি। হঠাৎ চারিদিকের সমস্ত নীরবতা ভেদ করে একটা প্রচণ্ড আওয়াজ হল। দেখি সামনের গিরিগাত্র থেকে প্রকাণ্ড এক তুষার স্তূপ ভেঙে প্রবল বেগে নিচে গড়িয়ে পড়ছে। দেখতে দেখতে আকাশ বাতাস তুষার কণায় আচ্ছন্ন হয়ে এল। ঝাপসা হয়ে গেল চারিদিক। বাতাসে ভেসে ভেসে ঠাণ্ডা সেই তুষার কণা এসে আমাদের চোখে-মুখে আছড়ে পড়তে লাগল। ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছি। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে গুর্ গুর্ শব্দটা বন্ধ হল। কিন্তু তাল তাল তুষার কাদা উত্তরের গিরিপ্রাচীর বেয়ে ঝর্ণাধারার মত নেমে আসছে পূর্ব্বি-কামেট হিমবাহের উপর। সে এক বীভৎস মনোরম দৃশ্য। একটু আগেও আশেপাশে যেখানে যত ফুটিফাটা দেখেছিলাম, এখন তার সামান্যই দেখতে পাচ্ছি। সাদা তুষারে সমস্ত ফাটল ভরাট হয়ে গেছে।

আকাশে বাতাসে এখন আর তেমন তুষার কণা নেই। আমরা বুক ভরে বাতাস টেনে আবার পথ চলতে শুরু করি।

বরফের উপর পায়ের ছাপ। আর কিছুদূর অন্তর অন্তর ডিমার্কেশন ফ্ল্যাগ পুঁতে প্রত্থোৎদারা রাস্তার নিশানা রেখে গেছেন। আমরা তাই দেখে দেখে তিন নম্বর-শিবিরের দিকে এগিয়ে চলি।

রাস্তার যেন আর শেষ নেই। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। এক একবার দূরের নিশানা দেখে মনে হচ্ছে এই বুঝি শিবিরের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি, আর চলতে হবে না। কিন্তু পরক্ষণেই সে ধারণা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

নিমাইদারা একষট্টি সালেও এই পথে এসেছিলেন। সুতরাং এ পথের সব কিছুই তাঁদের নখদর্পণে। তাই আর কতদূর যেতে হবে জানতে চাইতেই নিমাইদা দাঁড়িয়ে পড়েন। তারপর হাসতে হাসতে দূরে আঙুল দেখিয়ে বলেন—ওই যে ডান দিকে একটা 'রকি রিজ' দেখছ, ঠিক ওখানেই আমাদের ক্যাম্প লাগানোর কথা।

—তার মানে এখনও ঘণ্টা ছুয়েকের পথ…

—না না অত হবে না। নিমাইদা হাসতে হাসতে বলেন, জানিনা এ ক'বছরে এখানকার গ্লেসিয়ারের কি পরিবর্তন হয়েছে। যদি খুব ভেঙে চুরে না গিয়ে থাকে তাহলে এখান থেকে সোজাসুজি আর এক ঘণ্টার পথ।

দিলীপদা আমাদের অনেক পিছনে ছিলেন। তার বুকে ছ'খানা ক্যামেরা ঝুলছে। মুভি ক্যামেরাটা কেস-এ ঢোকাতে ঢোকাতে হঠাৎ পাশ থেকে তিনি বলে ওঠেন—যা-ই বল নিমাইদা, চার বছরে গ্লেসিয়ারের তেমন কোনই পরিবর্তন হয় নি। তাই না?

—একেবারে হয় নি বললে ভুল হবে দিলীপ। তবে সামান্য যেটুকু পরিবর্তন হয়েছে সহজে চোখে পড়ে না, এই বলে তিনি নিমা থনডুপ যেখানে পড়ে গিয়েছিল, সেই জায়গাটার উল্লেখ করে বলেন

ওই জায়গার কি সাংঘাতিক পরিবর্তন হয়ে গেছে লক্ষ্য করেছ কি? গতবার ওখানে গ্লেসিয়ার অতটা মারাত্মক ছিল না।

—তা ঠিক। দিলীপদা নিমাইদাকে সমর্থন করেন।

প্রচণ্ড হাঁপাচ্ছি। এক একটি পদক্ষেপে রক্ত যেন জল হয়ে যাচ্ছিল। কি ভাবে যে বাকি পথটুকু পাড়ি দেব ভেবে কোন কূল কিনারা পাচ্ছি না।

তিন নম্বর শিবিরের কাছাকাছি আসতেই অকস্মাৎ তুষারপাত শুরু হল। বলতে গেলে অভিযানে এসে এই প্রথম আমরা তুষারপাতের সম্মুখীন হলাম। প্রবল ঠাণ্ডায় হাত পায়ের আঙুল জ্বলতে লাগল। কোনমতে বাকি পথ অতিক্রম করে আমরা সকলে তৃতীয় শিবিরে হাজির হলাম। এখন বিকেল পাঁচটা।

তাপসদা গতকালই প্রদ্যোৎদার সঙ্গে এখানে উঠে এসেছেন। তাঁরা আমাদের তাঁবুর মধ্যে এনে বসালেন। পাসাং ফুতার, শেরিং লাকপা ও পাসাং শেরিং ছিল শিবিরে। ওরাও সকলে এগিয়ে এল আমাদের সাহায্য করতে। জুতো মোজা থেকে তুষার পরিষ্কার করে দিয়ে আমাদের গরম চা খেতে দিল।

বেশ কয়েকদিন পরে পাসাং ফুতারের সঙ্গে দেখা। ধীর স্থির অচঞ্চল এই মানুষটির পর্বতারোহণ সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা। জীবনে বহু পর্বতাভিযানে যোগদান করেছে সে। কিন্তু সে সব কীর্তির কথা খুব কম লোকই জানে—একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধুরা ছাড়া। নাম ডাক-এর প্রতি তার ভীষণ অনীহা। সে সব কথা বললে তার চোখ মুখ লাল হয়ে যায়।

দীর্ঘাঙ্গী, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এই মানুষটির সব চেয়ে বড় গুণ—কথা কম বলে আর কাজ করে বেশী। বিশ্বদেবদার কাছে শুনেছি জাপানের পর্বতারোহীরা পাসাংকে কিছুদিন আগে জাপানে নিয়ে গিয়েছিলেন এভারেষ্ট সম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্য। অথচ আশ্চর্য সে নিজে থেকে কখনও সেকথা কাউকে বলেছে বলে শুনি নি।

পাসাং আমার কাঁধে হাত রেখে হাসতে হাসতে বলে—খুব ঠাণ্ডা লাগছে, তাই না ?

—হ্যাঁ, ভীষণ।

—এক কাজ কর, জুতো-মোজা খুলে স্লিপিং ব্যাগের ভেতর ঢুকে পা গরম করে নাও। দেখবে খুব আরাম লাগবে। এই বলে সে আমার জুতো খুলতে উদ্যত হয়।

আমি তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করি। কিন্তু কিছুতেই নিরস্ত করতে পারি না। সে হেসে বলে—প্রাণেশ সাব, হিমালয়ে এটাই নিয়ম। না করাটাই বরং অনিয়ম।

পাসাং শেরিং সবচেয়ে খুশি দিলীপদাকে দেখে। বলতে গেলে হরিদ্বার থেকেই সে ছিল দিলীপদার পার্শ্বচর। নানা ফাইফরমাশ খাটা ছাড়াও মুভিক্যামেরায় ছবি তুলতে সে নানাভাবে তাঁকে সাহায্য করত। স্বভাবতঃই দিলীপদার সঙ্গে তার একটা বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কাজেই বেশ কয়েকদিন পরে আজ দিলীপদাকে এখানে পেয়ে সে আত্মহারা হয়ে উঠেছে। কী করে কী ভাবে যে দিলীপদাকে আদর-যত্ন করবে সে যেন ভেবে পাচ্ছে না। ছোট্ট ছেলের মত শুধুই ছটফট করছে।

রাতে শিবিরের বর্তমান স্থান নিয়ে নানা আলোচনা হল। প্রদ্যোৎদা বললেন—তৃতীয় শিবিরের স্থান নির্বাচন যথাযথ হয় নি। তাঁর মতে আরও কয়েক শো ফুট ওপরে এগিয়ে গিয়ে তাঁবু ফেলা উচিত ছিল। তা না হলে তৃতীয় শিবিরের সঙ্গে চতুর্থ শিবিরের যোগাযোগ রাখা অত্যন্ত কঠিন হবে। অথচ এখন এই শিবির উঠিয়ে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাওয়াও খুব সহজ নয়। সমস্ত মালপত্র নিয়ে যেতে হলে একটা দিন নষ্ট হবে।

তবু নেতা আর সহনেতা সিদ্ধান্ত নিলেন, বর্তমান শিবির আরও একটু উপরে নিয়ে স্থাপন করতে হবে। তা না হলে উপরের দিকে কাজের বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে।

সারারাত তুষারপাত অব্যাহত থাকলেও ভোরবেলা যথারীতি আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। সকাল দশটা নাগাদ এখানকার শিবির গুটিয়ে ফেলা হল। প্রায় মাইল খানেক দূরে কামেটের দক্ষিণ-পূর্বে উনিশ হাজার ছশো ফুট উঁচুতে হিমবাহের পার্শ্ব-গ্রাবরেখায় তৃতীয় শিবির প্রতিষ্ঠা করা হল। শেরপা আর লকুলরা একদিনেই সমস্ত মালপত্র তুলে নিয়ে এল। এমন সহযোগিতার দৃষ্টান্ত বিরল।

বিকেলের দিকে মদনদা এক নম্বর শিবির থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

/

উত্তর ও উত্তর-দক্ষিণে স্বর্ণময় শ্বেতশুভ্র কামেট—আমাদের দ্বিতীয় লক্ষ্য। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে সকলেই দেখছে। দেখছি আমিও। কী সুন্দর। গাঢ় নীল আকাশের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। লাল গ্র্যানাইট পাথরের ছটা কামেটের সারা অঙ্গে। অস্তাচলগামী সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু এক মোহময় স্বপ্নসৌধ সৃষ্টি করেছে।

১৮৮৫ সাল থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে প্রায় দশটি অভিযান আয়োজিত হয়েছে কামেটকে ঘিরে। তার মধ্যে ডঃ এ. এম. কেলাস এবং কর্নেল এইচ. টি. মোরসেড-ই বোধহয় ১৯২০ সালে এ পথে তেইশ হাজার ছশো ফুট উঁচু পর্যন্ত পৌঁছুতে সক্ষম হন। তার পরেই ১৯৩৭ সালে সর্বকালের সেরা পর্বতারোহী স্মাইথ সর্বপ্রথম কামেট শৃঙ্গে আরোহণ করতে সমর্থ হন।

পর্বত শ্রেণীটি উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত। চারটি শৃঙ্গ রয়েছে। বাকি তিনটি হচ্ছে পশ্চিম আবিগামিন (২৪,২০০ ফুট), পূর্ব আবিগামিন (২৪,১৭০ ফুট) ও মানা।

দলনেতা বিশ্বদেবদা বোধ করি 'রাশ ট্যাকটিকস'-এর নীতি অনুসরণ করার পক্ষপাতী। তাই মাত্র একদিন বিশ্রাম দেবার পরেই তিনি আজ মদনদা ও প্রদ্যোৎদাকে চতুর্থ শিবির প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন। তাঁরা ২০,৪০০ ফুট উঁচুতে মানার উত্তর-পূর্ব দিকে,

কামেটের দক্ষিণে একটি রক্-বাটট্রেসের উপর চতুর্থ শিবির পত্তন করবেন।

বিকেলের দিকে সহসা তুষারপাত শুরু হল। প্রথমে হোমিও-প্যাথি ওষুধের মত সূক্ষ্ম দানা, পরে পাউডারের মত তুষার পড়তে লাগল। নিশ্ছিদ্র সে তুষারপাত। তাঁবুর উপর জমে জমে তাঁবু টল-টলায়মান। সবশুদ্ধ এখনই বুঝি ভেঙে পড়বে। আমরা মেসটেন্টের উপর থেকে তুষার ঝাড়তে শুরু করলাম। কিন্তু একটু পরে পরেই তাল তাল স্তূপীকৃত তুষার সরাতে সরাতে নাজেহাল হয়ে পড়ি। অবশেষে বিরক্তি ধরে গেল।

তিন দিন ধরে চলল এই তুষারপাত। উপরের এবং নিচের শিবিরগুলির সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেল রসদ সরবরাহ ব্যবস্থা। আমরা শঙ্কিত হলাম। প্রকৃতির এই তাণ্ডব এভাবে চললে অভিযান পরিত্যক্ত হতে বাধ্য। তার চেয়েও বড় কথা, দিন-রাত বিরামহীনভাবে যদি এই হারে তুষারপাত হয়, তা হলে খাদ্যের অভাবে সকলকে না খেয়ে মরতে হবে। নিচে নেমে আত্মরক্ষা করারও কোন উপায় থাকবে না। আমরা সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

এদিকে দিনরাত মেসটেন্টের মধ্যে শুয়ে-বসে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছি। প্রথম দুটো দিন গল্পগুজব হাসিঠাট্টা এবং গান-বাজনার মধ্য দিয়ে কেটে গিয়েছিল। তখন ভাবি নি এভাবে দিনের পর দিন তুষারপাত চলবে। কিন্তু আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন তাঁবুর গবাক্ষ পথে আকাশের দিকে তাকালাম, তখন শঙ্কিত না হয়ে পারলাম না। ঘন কালো কুচকুচে মেঘ। কেমন একটা থমথমে ভাব!

আশেপাশে যতদূর দৃষ্টি যায়, ধূ ধূ করছে কেবল শাদা। মনে হল সারা পৃথিবীটাই প্রাণহীন শাদাটে হয়ে গেছে। তাঁবুর আশেপাশে সর্বত্র পাহাড়প্রমাণ তুষার জমে আছে। মেসটেন্টের দরজা দিয়ে

সহজে বাইরে বেরুতে পারলাম না। স্তূপীকৃত নরম তুষার সরিয়ে পথ তৈরি করে বেরুতে হল।

এই নিদারুণ দুর্যোগের জন্য কুলীরা খুবই মুষড়ে পড়েছে। তাদের অনেকেরই পর্যাপ্ত জামা-কাপড় নেই। অসহ্য ঠাণ্ডায় তারা রীতিমত কষ্ট পাচ্ছে। তার ওপরে উঁচুতে অক্সিজেনের স্বল্পতার জন্যও প্রত্যেকেই বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে। অনেকের মাথা ঘোরাচ্ছে, গা বমি-বমি করছে, ঘুম বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য কয়েকজন তো পাগলের মত ছটফট করতে শুরু করে দিয়েছে।

মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেছে শেরপাদেরও। বিশেষ করে কিচেনে যে ক'জন শেরপা রয়েছে তারা আগুন জ্বালাতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। স্টোভগুলো ঠাণ্ডায় প্রায় অচল হয়ে যাওয়ার জন্য রান্নাবান্না করার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে।

বিশ্বদেবদা বললেন—আমি ভাবছি অন্য কথা। আমরা তো তবু এখানে এতগুলো লোক রয়েছি যা করে হোক কাটিয়ে দেব। কিন্তু প্রত্যোৎ ও মদন? তারা না জানি কি দুর্ভোগ পোয়াচ্ছে উপরের শিবিরে। ওদের কাছে পর্যাপ্ত রেশন পর্যন্ত নেই যে…

—ক'দিনের রেশন গেছে ওপরে? নারায়ণ জিজ্ঞেস করে।

—দু'দিনের। তবে টেনেটুনে তিন দিন বড়জোর চলতে পারে, আমি বলি।

—কে জানতো, ওরা যাবার পরেই এভাবে স্নো-ফল শুরু হবে! বিশ্বদেবদা ম্লানভাবে বলেন।

—স্টোভগুলো যদি ঠিকভাবে কাজ না করে তা হলে তো ওরা না খেয়ে মরবে। সামান্য জলটুকুও খেতে পারবে না! নিমাইদা হাতের ওপর চিবুক রেখে মন্তব্য করেন।

—স্টোভ-পিন দিয়ে দিয়েছিলে তো? দিলীপদা আমার দিকে তাকান।

—দিয়েছিলাম! তবে…

—ক'টা ?

—ছ সাতটা হবে।

—আরে অত ভাবছিস কেন ? ছাখ না, আজই বিকেলের মধ্যে স্নো-ফল বন্ধ হয়ে যাবে। তাপসদা দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে আশ্বাস দেন।

—সে তো তুই কাল সকালেও বলেছিলি, আজ রোদ উঠবেই। বামুন মানুষের হক্ কথা বলে খুব বড়াইও করেছিলি মনে আছে ? সুজন টিটকিরি দেয় স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে শুয়ে শুয়ে।

—ক্যালকুলেশানে একটু ভুল ছিল গতকাল। আজ আর তা নেই, তোকে বলে দিচ্ছি সুজন। মনে রাখিস, আমি ভট্চাজ বামুন। এ লাইনে বংশ পরম্পরায় আমাদের একটা সুনাম আছে। অতএব বেদবাক্য বলেই ধরে নিতে পারিস।

—ঠিক আছে···

সুজন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু নিমাইদা তাকে বাধা দিয়ে বলেন—চুপ কর সুজন। তারপর তাপসদার দিকে তাকিয়ে বলেন—অত কথা বুঝি না তাপস। তোমার কথা মত আজ বিকেলের মধ্যে যদি রোদ না ওঠে, তা হলে আমরা যা শাস্তি দোব তা-ই তোমাকে মাথা পেতে নিতে হবে। রাজি তো ?

—তার মানে ?

—তোমার ডিমোশান হবে।

—সেটা কি আবার নিমাইদা ? দিলীপদা সহাস্যে তাকান।

—ধ্রুব ওকে প্রমোশান দিয়ে রাতারাতি অনেক উঁচুতে তুলে দিয়েছিল মনে আছে ?

—হ্যাঁ। বোধহয় কর্নেল পদে প্রমোশন দিয়েছিল। তাই না রে নারায়ণ ?

—আমরা একেবারে অরডিনারি সিপাই পদে নামিয়ে দোব।

সারারাত বাইরে তাঁবু পরিষ্কার করার ডিউটি দিতে হবে। নিমাইদা গম্ভীর গলায় বলেন।

—ওরে বাপস্। তাপসদা চিৎকার করে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে বলেন—তার চাইতে কোর্টমার্শাল করে আমার প্রাণদণ্ড দিও, সে-ও ভাল। কিন্তু আমি ওই বরফ পরিষ্কার করার-ডিউটি কিছুতেই করতে পারব না। দোহাই তোমার নিমাইদা!

এই সময় পাশের তাঁবু থেকে শেরপাদের চিৎকার শোনা গেল। ওরা যেন কি বলাবলি করছে। আমরা কান খাড়া করি। কিন্তু ওদের কথোপকথন কিছুই বুঝতে পারি না। বিশ্বদেবদা এখান থেকেই হাঁক দেন—ক্যায়া হুয়া সর্দার?

—উপরসে কই আ রহা বড়া সাব?

আমরা পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। এই প্রবল দুর্যোগের মধ্যে চার নম্বর শিবির থেকে কে আসছে? এ অবস্থায় তো কেউ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সহজে শিবির ত্যাগ করে না! তা হলে কি ওপরে কোন বিপদ-আপদ ঘটেছে যে, এখানে না এসে কোন উপায় ছিল না? কিন্তু কি বিপদ ঘটতে পারে? যে হারে তুষারপাত হচ্ছে তাতে তুষারের নিচে তাঁবু চাপা পড়ে যায় নি তো? কিম্বা তুষার ধসে অন্য কিছু অনর্থ ঘটল? কিন্তু চার নম্বর শিবিরে ওই জাতীয় কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে বলে তো শুনি নি। তুষার ধস নামবার মত জায়গা ওটা নয়। তা হলে ব্লিজার্ড অর্থাৎ তুষার ঝঞ্ঝায় অতিষ্ঠ হয়েই নেমে এসেছে কেউ? কিন্তু...

—কৌন কৌন আ রহা সর্দার?

—ইঁহাসে মালুম নেই হোতা হ্যায়, বড়া সাব। লেকিন এক... নহী সাব, দো আদমি আরাহা...

আমরা আর তাঁবুর ভেতর থাকতে পারি না। ক্লাইম্বিং-সু পরে উইণ্ডপ্রুফ জ্যাকেট গায়ে জড়িয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসি বাইরে।

ঘষা কাচের মত আবছা চারিদিক। দূরের কিছুই তেমন নজরে

পড়ে না। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর উত্তর-পূর্ব দিকে দু'টি কালো কিছু দেখতে পেলাম। ধীরে ধীরে এদিকেই এগিয়ে আসছে।

প্রবল উৎকণ্ঠার মধ্যে অনেকক্ষণ আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। অবিশ্রান্তভাবে পড়ে চলেছে তুষার। মুহূর্তের মধ্যে সর্বাঙ্গ শাদা হয়ে যায়, আবার তা ঝেড়ে ফেলে দিই। এই ভাবে বেশ খানিকক্ষণ ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবার পর কালো বিন্দু দু'টি ক্রমশঃ আরো এগিয়ে এল। ঠাণ্ডায় ও ভয়ে সারা দেহ কাঁপছে আমার। কয়েকবার চেষ্টা করেও কোন কথা বলতে পারলাম না।

অবশেষে বিন্দু দুটি বড় হয়ে খুব কাছে এল। দেখতে পেলাম স্পষ্ট। এ যে প্রদ্যোৎদা আর মদনদা! আপাদমস্তক তাঁদের একেবারে শাদা হয়ে গেছে। মুখখানি কালো কুচকুচে। বরফে পুড়ে এমন হাল হয়ে থাকবে। চক্ষু কোটরাগত। খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। অত্যন্ত ক্লান্ত। পিঠ থেকে রুকস্যাকের বোঝা নামিয়ে নিতেই ওঁরা আমাদের জড়িয়ে ধরেন। তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে মদনদা বললেন—জল। জল দে তো একটু। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে!

আমরা ওদের দু'জনকে ধরাধরি করে মেসটেণ্টের ভেতরে নিয়ে আসি। গা-হাত-পা থেকে তুষার ঝেড়ে পরিষ্কার করে বসিয়ে দিই এয়ার-ম্যাটট্রেসের ওপর। তারপর জুতো খুলে দিই। ওরা স্লিপিং-ব্যাগে ঢুকে গরম হবার চেষ্টা করে। ইত্যবসরে জল আসে। আসে চা-বিস্কুট। তাই খেয়ে দু'জনে বেশ খানিকটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তারপর ধীরে ধীরে তাঁরা বলেন, চতুর্থ শিবিরে কি নিদারুণ সংগ্রাম করতে হয়েছে। খামখেয়ালি মানা রুদ্রমূর্তি ধারণ করে কী অসহনীয় পরিস্থিতির মুখে ঠেলে দিয়েছিল তাঁদের! জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা মনে গাঁথা হয়ে থাকবে।

প্রদ্যোৎদা বললেন—এখান থেকে চতুর্থ শিবিরে যাওয়ার পর আবহাওয়া বেশ ভালই ছিল। পরের দিন সকালে পঞ্চম শিবিরের জায়গা নির্বাচন করতে যাব সব ঠিকঠাক। কিন্তু রাত্রি সাড়ে আটটার

পরে হঠাৎ সব ওলটপালট হয়ে গেল। ভীম বেগে ছুটে এল ঝড়, আর সেই সঙ্গে মুষলধারে তুষারপাত। সারারাত ধরে আবহাওয়ার অভিশাপ আমাদের শিবিরের ওপর আছড়ে পড়তে লাগল। তাঁবুর মধ্যে বসে থাকতে পারি না। এই বুঝি উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে নীচে ছুঁড়ে দেবে আমাদের! এক মুহূর্তের জন্যও এই ঝড়ের বিরাম ছিল না। সেই সময় তাঁবুর বাইরে যাওয়া আত্মহত্যার সামিল হত। তাই আত্মরক্ষার জন্য ভিতরেই আশ্রয় নিয়েছিলাম আমরা।

গতকাল রাত পর্যন্ত এভাবে কাটাবার পর মনে হল, আর ওখানে পড়ে থাকা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। মৃত্যু যখন অবধারিত তখন এভাবে তাঁবুর মধ্যে বসে বসে মরে লাভ কি? ফুতার আর মদনকে বললাম সে কথা। ওরা বলল, চল, কাল চেষ্টা করি, যদি নিচে নামা যায়!

সত্যি কথা বলতে কি, আবহাওয়ার এমন হিংস্রতা আমি আর কখনও দেখি নি! যেমন হাওয়ার বেগ, তেমনি তুষার ধারা। কাজে কাজেই বাধ্য হয়েই পঞ্চম শিবিরের জায়গার সন্ধানে যাওয়ার আশা ছাড়তে হল। এ অবস্থায় পশ্চাদপসরণ করা ছাড়া আমাদের সামনে আর অন্য কোন উপায় ছিল না।

সব শুনে বিশ্বদেবদা বললেন—খুব ভাল করেছিস এখানে নেমে এসে। ফুতার কোথায়?

—আসছে। মদনদা বলেন, ওর শরীরটাও একটু খারাপ হয়েছে। ও ধীরে ধীরে আসছে। কোন চিন্তা নেই।

সব শুনে বিশ্বদেবদা শেরপা সর্দার লাকপা আর সোনাকে ডেকে পাঠালেন। ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে, ফুতারকে নিয়ে আসবার জন্য তাদের এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেন তিনি।

প্রবাদ আছে, বিপদে পড়লে অতি ঘোর নাস্তিকেরও দেবদেবীর পুজায় আপত্তি থাকে না। কার্যসিদ্ধির জন্য তখন সে নাকি যা খুশি তা-ই করতে প্রস্তুত থাকে।

এর সত্যি-মিথ্যা অবশ্য আমার জানা নেই। কিন্তু হিমালয়ে এসে এই শ্রেণীর মানুষগুলোকে ভোল পাল্টাতে দেখা গেছে বিস্তর। শোনা যায়, শাদা চামড়ার মানুষ—যাদের হিন্দু দেব-দেবীর ওপর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই, তারাই ঠ্যালায় পড়ে ষোড়শ উপচারে কত না পূজা দিয়েছেন আমাদের ঠাকুর-দেবতার উদ্দেশে। বিদেশী অভিযাত্রীদের লেখা পর্বতাভিযান সংক্রান্ত বই পড়লে এ সম্পর্কে অনেক চমকপ্রদ ঘটনা জানা যায়।

কিন্তু সে-সব কথা এখন থাক। আমাদের কথাই বলি। প্রবল তুষারপাতের জন্য আমরা যখন এক নিদারুণ হতাশার মধ্যে কাল যাপন করছি, তখন শেরপারা এসে বলল—প্রকৃতিদেবী কোন কারণে রুষ্টা হয়েছেন। তাঁকে খুশি করতে হলে পুজো দিতে হবে। নইলে এই আবহাওয়ার কোন পরিবর্তন হবে না।

শেরপারা সাধারণতঃ ধর্মভীরু। বিশেষ করে তারা যখন পর্বত অভিযানে যায়, তখন ধর্মের প্রতি সজাগ হয়ে ওঠে। এ জাতীয় নানা কথা ইতিপূর্বে আমরা বহুবার বলাবলি করেছি। এমন কি, হাসি-ঠাট্টাও করেছি অনেক। কিন্তু আশ্চর্য, এখন কিন্তু আমরা কেউ-ই কোন মন্তব্য করলাম না বরং বিনা বাক্যব্যয়ে পুজো দিতে অঙ্গীকার করলাম।

তুমুল তুষারপাতের মধ্যে পাসাং শেরিং কিচেনের এক পাশে নরম তুষার আর বরফ দিয়ে মূর্তি তৈরি করল। বোধ করি প্রকৃতি-দেবীর কাল্পনিক মূর্তি। শেরপা সর্দার লাকপা উপচার নিয়ে এল। একটি খালি নেসকাফের কৌটোতে কিছু জ্বলন্ত কাঠকয়লা। তার উপর বেশ খানিকটা সামপা ঢেলে দিয়েছে। তাতে ধোঁয়া উঠছে। আর একটি থালাতে খানিকটা ঘি, চিনি, চকোলেট, চা, মাখন ও 'রম'। দেবীর সামনে ভক্তিভরে রেখে লাকপা হাত জোড় করে দাঁড়াল। দেখাদেখি আমরাও সকলে দাঁড়ালাম গোল হয়ে। উইণ্ড-প্রুফ জ্যাকেটের হুড্ মাথায় তুলে প্রবল তুষারপাতের মধ্যে হাত

জোড় করে আমরা প্রার্থনা করলাম—হে দেবি! একটু মুখ তুলে চাও। তোমার কাছে আমরা আর কিছু চাই না, শুধু কতগুলি নির্মেঘ সূর্যকরোজ্জ্বল দিন দাও।

তার পরে তাপসদা পরম ভক্তিভরে সূর্যস্তোত্র পাঠ শুরু করলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে গলা মেলাই।

॥ আট ॥

তাপসদার ভবিষ্যদ্বাণীর জন্যই হোক কিম্বা শেরপাদের পূজোর জন্যই হোক, সত্যিই দেবী মুখ তুলে চাইলেন। চারদিন অবিরাম তুষারপাতের পরে দশ তারিখের নির্মেঘ নীলাকাশ আমাদের কাছে আশার বাণী নিয়ে এল। পুব-আকাশে সূর্যের লাল রশ্মি দেখে আমরা আনন্দে আত্মহারা হই। শতকোটি প্রণাম জানাই প্রকৃতি-দেবীকে।

আগেই ঠিক ছিল, আবহাওয়া ভাল হলেই নিমাইদা এবং আমি চার নম্বর শিবিরের দখল নিতে যাবো।

মদনদারা চার নম্বর শিবিরে খাবার-দাবার, তাঁবু, স্টোভ, থালা-বাসন, কেরোসিন ইত্যাদি যেখানে যা পড়ে ছিল, তেমনি ভাবেই ফেলে রেখে পালিয়ে এসেছিলেন। ইতিমধ্যে সে-সমস্ত তুষারপাতে চাপা পড়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। সে-কথা ভেবে আমরা দ্বিগুণ পরিমাণ রসদ-সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে রওনা হলাম।

চারিদিকে শুধু বরফ আর বরফ। যে দিকে তাকানো যায় বরফ ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না। মনে হয় গোটা পৃথিবীটাকে কে বা কারা যেন চুনকাম করে শাদা করে দিয়েছে। সূর্যালোকে সমস্ত অঞ্চল চিক্‌চিক্ করে জ্বলছে। কালো গগলস ছাড়া তাকানো যায় না। মাথা ঘুরে যায়।

কঠিন বরফের উপর রাশি রাশি তুষার। কোথাও হাঁটু সমান

আবার কোথাও বা তার চাইতেও বেশি। এরই মধ্য দিয়ে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলি। সে এক প্রাণান্তকর অবস্থা। তুষার কাদার ভেতর পা ফেলতে যত না মেহনত, তার চেয়েও বেশি মেহনত সেখান থেকে পা তুলে আনতে। গোড়ালি না মচকে যায়।

ভয়ে ভয়ে এগুতে লাগলাম। ফলে গতি বেশ মন্থর। অক্সিজেনের অভাবের জন্য ওপরের দিকে সেটা আরো শম্বুকগতিতে পরিণত হল। মনে হল ফুসফুস বুঝি ফেটে যাবে এখুনি। তাই এক কদম করে চলি আর বিশ্রাম নিই। বুক ভরে বাতাস নিয়ে পরবর্তী পা ফেলি।

এইভাবে ঘণ্টা দু'য়েক চলার পরে আমরা ঝুলন্ত হিমবাহের (Hanging glacier) কাছে এসে পৌঁছাই।

একেবারে নূতন চেহারা এই ঝুলন্ত হিমবাহের। তিন চারতলা বাড়ির সমান উঁচু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের চাঁই। সমস্ত হিমবাহ জুড়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। দূর থেকে সুন্দর ঝর্ণার মত দেখায়। মনে হয় কোন জাদুবলে নৃত্যরতা ঝর্ণার জলধারা স্তব্ধ হয়ে গেছে।

বরফের ঢেউ-এর পরে ঢেউ। যেন আকাশ থেকে নেমে এসেছে। বড় সুন্দর। ধবধবে শাদা নয়, নীলাভ। অদ্ভুত একটা আভা ঠিকরে বেরুচ্ছে তা থেকে।

আপাতদৃষ্টিতে মনোমুগ্ধকর হলেও হিমবাহের এমন সর্বনাশা চেহারা আমি ইতিপূর্বে খুব কমই দেখেছি। একটু ভাল করে লক্ষ্য করতেই দেখতে পেলাম গোটা হিমবাহটাই ফেটেফুটে চৌচির। দূর থেকে যেগুলোকে প্রকৃতির আলপনা মনে হয়েছিল, সেগুলো আসলে বিরাট বিরাট এক একটি গহ্বর। নিকষ কালো-কুৎসিৎ এই গহ্বর পাতাল পর্যন্ত বিস্তৃত কি-না জানি না। তবে এটুকু অনুমান করতে কষ্ট হয় না, ওখানে পড়লে কোনদিন আমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। শীতল সমাধি অবধারিত।

চারিদিকে একটা থমথমে ভাব। বাতাসের বেগও তেমন নেই। কেমন একটা নৈঃশব্দ সমস্ত অঞ্চল জুড়ে। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে টুং টাং রিম্‌ঝিম্ শব্দ। মনে হচ্ছে, ধারে-কাছে কোথাও কেউ অর্কেস্ট্রা বাজাচ্ছে। সুন্দর সুমধুর তার ঐকতান।

আসলে এই সুমধুর ঐকতান আর কিছু নয়। প্রকৃতির আপন খেয়ালে হিমবাহের অভ্যন্তরে চলেছে ভাঙা-গড়ার খেলা। টুংটাং শব্দে ভেঙে পড়ছে বরফের টুকরো। রৌদ্রতাপে ফাটছে বরফের চাঁই। আর তাকেই মনে হচ্ছে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা।

একে উঁচুতে উঠে আসার জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রবল কষ্ট হচ্ছে, তার ওপরে এ জাতীয় বিপজ্জনক পথে চলা কষ্টকর। হিমবাহের ফাঁকে ফাঁকে পথ খুঁজে অগ্রসর হতে বেশ বেগ পেতে হল। মদনদারা ডিমার্কেশন ফ্ল্যাগ পুঁতে পুঁতে রাস্তার যে নিশানা রেখেছিলেন, তার আর বিশেষ কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। অবিরাম তুষারপাত আর বাতাসের তাণ্ডব নৃত্যে তা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে কে জানে।

অবশেষে জটিল হিমবাহের 'সিরাক' (Serac) 'বার্গসরুণ্ড' (Bergchrund) চোরা বরফের ফাটল পেরিয়ে আমরা চতুর্থ শিবিরে পৌঁছুলাম। পথের শেষ পর্যায়ে কুড়ি হাজার ফুটেরও বেশি উঁচুতে একটি বিপজ্জনক রক্‌ক্লাইম্বিং বা শৈলারোহণ করতে হয়েছে। প্রায় একশো ফুটের মত উঁচু সেই পাথরের প্রাচীরে নরম তুষারের প্রলেপ থাকায় আরোহণ করতে প্রভূত পরিশ্রম করতে হয়েছে আমাদের। অসংখ্য ধন্যবাদ পাসাং, মদনদা, প্রদ্যোৎদাদের। তাঁরা যদি আগে এখানে পিটন পুঁতে দড়ি না লাগিয়ে রাখতেন, তা হলে আমাদের আজ এখানে পৌঁছুতে ভীষণ বেগ পেতে হত। বিশেষ করে দুর্ঘটনা এড়িয়ে পিঠের ভারি বোঝা নিয়ে লকুলরা কিছুতেই এ পথে আসতে পারত না। শৈলারোহণকালে পচা আলগা নরম পাথর হাত থেকে খসে যেত নিশ্চয়ই, আর তখনই ঘটত দুর্ঘটনা।

বিশ্বদেবদা, নারায়ণ, সুজন ও তাপসদাও এসেছিলেন মালপত্র

নিয়ে আমাদের মদত দিতে। তাঁরা ফিরে গেলেন আবার তৃতীয় শিবিরে।

একটি 'রক বাট্‌ট্রেসের' ওপর চতুর্থ শিবিরের (২০,৪০০ ফুট) এই স্থানটি বড়ই অদ্ভুত। বরফের সমুদ্রে এ যেন একটি ছোট্ট অপরিসর নির্জন দ্বীপ। সর্বদা ঝড়ো বাতাস বইছে। সামনে তেমন কোন সুউচ্চ গিরিশ্রেণী না থাকায় উত্তরে তিব্বতী উপত্যকা থেকে সরাসরি আগত ঠাণ্ডা ঝড়ো বাতাস জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলছে। হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। কথা বলতে গিয়ে কিছুই বলতে পারছি না। ঠোঁট-মুখ বেঁকে যেতে চাইছে।

এখানে দিবারাত্রি বিরামহীন বাতাস বয় বলেই হয়তো তেমন বরফ জমতে পারে না। উড়িয়ে নিয়ে ফেলে দেয় নিচে—হিমবাহে। আর তাই এখানকার এই পাথুরে জমিটুকুর স্বাতন্ত্র্যতা বিশেষভাবে চোখে পড়ছে।

চতুর্থ শিবিরের উত্তর-পশ্চিমে মানা। মূল শিবির থেকে একবার পর সুন্দরী মানাকে অনেক দিন হল দেখি নি। বড় আশা ছিল, এই শিবির থেকে তার সুন্দর মুখখানি আজ দেখতে পাব।

কিন্তু পেলাম না। অন্যান্য শিবিরগুলোর মতই এ শিবির থেকেও মানাকে দেখা যায় না। কিন্তু কামেট তার সুন্দর মোহময় রূপ নিয়ে সর্বদা ভাস্বর। যতই তার কাছে আসছি, সে যেন ততই তার রূপ ঢেলে উজাড় করে দিচ্ছে। এখান থেকে উত্তর-দক্ষিণে কামেটকে দেখতে পাচ্ছি। ঢল ঢল করছে তার কাঁচা অঙ্গ। ভয় হচ্ছে এখনই বুঝি গায়ে গা লেগে যাবে। বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি শুধু।

কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। দেখতে দেখতে মেঘের আনাগোনা শুরু হল। প্রথম কয়েকবার ঝড়ো বাতাসের তাড়া খেয়ে পালিয়ে গেলেও তারা আবার ঘুরে-ফিরে উড়ে এল। তারপর আস্তে আস্তে ঘিরে ফেলল কামেটকে। পরে ক্রমশঃ সমস্ত আকাশ। বন্ধ হয়ে গেল

বা্তাস। শুরু হল তুষারপাত। উপায়ান্তর না দেখে আমরা তাঁবুর মধ্যে এসে ঢুকি।

ক্লাইম্বিং বুট থেকে চেঁছে-মুছে বরফ পরিষ্কার করে শ্লিপিং ব্যাগের ঢোকবার জন্য উদ্যত হয়েছি, এমন সময় নিমাইদা হাঁক ছাড়লেন—প্রাণেশ, শুয়ে পড়েছ নাকি?

—না নিমাইদা! শোব ভাবছি। কেন?

—ডিনার তো তৈরি। একেবারে সেরে নিয়ে শুলেই তো ভাল করতে!

—ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।

—না, না, আসতে হবে না। নিমাইদা বাধা দিয়ে বলেন—শুয়ে পড়ো না। ছুঞ্জে বলল, সে এখনই ডিনার নিয়ে এখানে আসছে।

—তাই নাকি? আমি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলি—সত্যি কথা বলতে কি নিমাইদা, আমি মনে মনে ঠিক একথাই ভাবছিলাম। খাবারটা যদি এখানে তাঁবুর মধ্যে বসে-বসে পেতাম, বড়ই ভাল হত।

—মানুষ আন্তরিকভাবে যা চায় তা সে পাবেই, জেনে রেখো প্রাণেশ!

—তার মানে?

—ঐ যে বললে, একটু আগে মনে মনে তুমি ভাবছিলে খাবারটা যদি এ সময় এখানে পাওয়া যেত, তা হলে বড় ভাল হত।

—হ্যাঁ।

—সেই জন্যই তুমি পাবে, নিমাইদা হাসতে হাসতে বলেন।

—সেকথা যদি বলেন, তা হলে তো আমরা কখনই এই স্নো-ফল বা ব্যাড ওয়েদার চাই নি। আন্তরিকভাবে আমরা চেয়েছি কয়েকটা ফুট-ফুটে দিন। আর চেয়েছি…

—পাবে প্রাণেশ, পাবে। আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি, আন্তরিকভাবে চাইলে ভগবান কখনই নিরাশ করেন না। তাঁবুর ভেতর ঢুকতে ঢুকতে নিমাইদা বলেন।

—কত কোর্সের ডিনার আজ? আমি খাবারের কথায় ফিরে আসি।

—দু' কোর্স।

—কি কি থাকছে?

—পরোটা আর মাংস।

—ব্যস?

—ফ্রুটস অবশ্য পাবে।

—কি ফ্রুটস?

—পাইন এ্যাপেল। আর সবশেষে গরম কফি।

—গ্র্যাণ্ড নিমাইদা, গ্র্যাণ্ড! কিন্তু খাবার জল পাওয়া যাবে তো?

—পাবে। তবে…

ক্লাইম্বিং বুটের ফিতে খুলতে খুলতে নিমাইদা কিঞ্চিত অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে থাকবেন হয়তো। আমি তাই পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁকে বলি—জল পাওয়া যাবে তো নিমাইদা?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, পাবে। দু'ইঞ্চির বেশি নয়। গম্ভীর গলায় জবাব দেন নিমাইদা।

শুনে আমি হতাশ হই। তেষ্টায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে এখনই। খাওয়া-দাওয়ার পরে একটু বেশী জল না পেলে তো মরেই যাবো! দু'ইঞ্চি মানে, আমাদের মগে কোয়ার্টার মগ জলও নয়। তাতে তেষ্টা মেটানো অসম্ভব। আমি বলি—এত কম!

—বাকিটা আমসত্ত্ব দিয়ে মিটিয়ে নিও। আমার রুকস্যাকে বেশ খানিকটা আমসত্ত্ব আছে, চেয়ে নিও, কেমন? অত্যন্ত নির্বিকারভাবে বলেন নিমাইদা। তারপর তুষার পরিষ্কার করার জন্য ভেতর থেকে দু'হাত দিয়ে তাঁবু ঝাড়া দেন।

আমাদের দলের সহনেতা নিমাইদা—নিমাই বোস, এক অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। তিনি কখন যে কি মুডে থাকেন, তা আগে থেকে অনুমান করা শক্ত। আপাতঃদৃষ্টিতে নিমাইদাকে রাগী মানুষ মনে হতে

পারে। কিন্তু আসলে তিনি তা নন। ভারি মজাদার মানুষ তিনি। তবে কাজের সময় তিনি যে ভীষণ সিরিয়াস, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অত্যন্ত ধীরে-সুস্থে কথা বলেন নিমাইদা। আর প্রতি কথাতেই কিছু না কিছু রসের টিপ্পনি থাকবেই যা শুনলে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়। অথচ তিনি নিজে তখন একদম হাসেন না।

পর্বতারোহী হিসেবে নিমাইদার নাম-ডাক আছে ঠিকই। কিন্তু তার চেয়েও তাঁর বেশি নাম অন্য কারণে। বাংলাদেশের পর্বতারোহীদের মধ্যে তিনি একজন পারদর্শী ম্যাপ-রিডার। এর আগে তিনি মোট তিনটি পর্বতাভিযানে ছিলেন। মদনদার সঙ্গে কাব্রুডোম (২১,৬৫০ ফুট) শীর্ষ আরোহণের কৃতিত্বও রয়েছে তাঁর।

তুষার পরিষ্কার করে নিমাইদা পুনরায় ম্লান স্বরে বলেন—খাবারের জল বেশি পাবে কোত্থেকে প্রাণেশ। বেচারী ছুপ্তে সেই দুপুর থেকে বরফ গলাতে গলাতে একেবারে নাজেহাল। চা-কফির জন্য জল তৈরি করতে ওকে যতটা না বেগ পেতে হয়েছে, তার চেয়েও বেশি বেগ পেতে হয়েছে আটা মাখার জল তৈরি করতে। ছুটো স্টোভে প্রায় তিনঘণ্টা সময় নিয়েছে বরফ গলাতে। তাই সে এখন অত্যন্ত টায়ার্ড, সুতরাং যেটুকু পাও, তাই দিয়েই আজকের মত তেষ্টা মিটিয়ে নাও!

এসব শুনে আমার ভীষণ খারাপ লাগে। সত্যিই তো, পাহাড়ে এসে বেশি জল খাওয়া বিলাসিতা। হাই অলটিচুডে রান্নাবান্না করা যে কি ঝামেলা, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। তাই আমি তাড়াতাড়ি নিমাইদাকে বলি—ঠিক আছে নিমাইদা, আমি বেশি জল চেয়ে ছুপ্তেকে বিব্রত করব না।

নিমাইদা ঠিকই বলেছিলেন। মানুষ আন্তরিকভাবে যা চাইবে, তা সে পাবেই যদি সেই চাওয়াটা ন্যায্য হয়। কিন্তু আমি কখনও

কিছু চেয়েছি বলে তো মনে পড়ছে না। আর আন্তরিকভাবে চাওয়ার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। তা হলে কি অবচেতন মনে আমি সত্যিই চেয়েছিলাম বাঁচতে। কি জানি, মনে পড়ছে না কিছুই। তবে একথা আমার স্পষ্ট মনে আছে, গত রাতে হঠাৎ যখন ঝড় উঠল, সামাল সামাল রব উঠল তাঁবুতে তাঁবুতে, তখন একটি কথাই আমার মনে গেঁথে ছিল, তা হল তাঁবুটাকে যেমন করে হোক খাড়া রাখতে হবে। তা না হলে জীবন বিপন্ন হতে বাধ্য। প্রকৃতির রুদ্ররোষের কবল থেকে কিছুতেই রেহাই পাব না।

কিন্তু এবকম বিভীষিকাময় রাত্রিতে, প্রবল দুর্যোগের মধ্যে যদি কেউ বাঁচার তাগিদ অনুভব করেও, তা হলে তার মনোবাঞ্ছা পূরণ হবেই তার কি কোন যৌক্তিকতা আছে? তা হলে পর্বতারোহণকালে এত প্রাণ ঝরে কেন? যাঁরা প্রাণ বলি দিয়েছেন, তাঁরা কি সকলেই বাঁচতে চান নি? কে বলতে পারে!

তবে একথা ঠিক, গত রাতে চার নম্বর শিবিরে হিমশীতল ঝড়ো বাতাসের যে তাণ্ডবনৃত্য শুরু হয়েছিল, তার কথা আমি জীবনে ভুলতে পারব না। এখন এই মুহূর্তে—রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতে গত রাতের সমস্ত ঘটনাটাকে একটা নিছক দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছি না।

মনে পড়ে। বিকেল তখন সাতটা কি সোয়া সাতটা। হ্যাঁ, বিকেলই বলব, কেননা তখনও সূর্য অস্তমিত হয় নি। দুপুরের পর থেকেই গুঁড়ি গুঁড়ি তুষার পড়ছিল। নিমাইদা আর আমাকে ডিনার খাইয়ে ছুপ্তে চলে গেছে ওদের তাঁবুতে। আমরা স্লিপিং ব্যাগের ভেতর ঢুকে উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে গরম কফি খাচ্ছি আর গল্পগুজব করছি, এমন সময় হঠাৎ শুরু হল ব্লিজার্ড।

কফি খাওয়া আমাদের মাথায় উঠল। দমকা বাতাস আর তুষারের আঘাতে আমাদের ছোট্ট 'টু মেন টেণ্ট'খানা মাটিতে নুয়ে পড়বার সামিল হল। আমি আর নিমাইদা তাঁবুর রড খাড়া রাখার

জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি। তা না হলে পবনদেবতা বস্তাবন্দী করে যে-কোন মুহূর্তে আমাদের নিচে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

দস্যিপনা প্রকৃতির সঙ্গে কতক্ষণ যুঝেছিলাম সঠিক মনে নেই। শুধু মনে আছে দমকা বাতাস যখন থামল, তখন আমরা রীতিমত হাঁপাচ্ছি। সারা দেহে গুঁড়ি গুঁড়ি তুষারের প্রলেপ। তীব্র ঠাণ্ডায় হাত দুটো একেবারে অবশ হয়ে গেছে। মনে হল কনুই থেকে হাত দুটো কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অনেকক্ষণ পরে হাতে যখন সার ফিরে এল, তখন একটু ঘুমনোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু বিধি বাম। রাত দুটো নাগাদ আবার শুরু হল বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ অনেকটা সমুদ্রগর্জনের মত। শব্দটা ক্রমশঃ মারাত্মক আকার ধারণ করল। তাঁবুটাকে টিকিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। ঝড়ের মুখে পড়ে ডিঙি নৌকোর যে রকম হাল হয়, ঠিক তেমনিভাবে আমাদের তাঁবুটা দুলতে লাগল। এই অবস্থায় তাঁবুর ভেতর শুয়ে থাকা তো দূরের কথা, বসে থাকাও দায়। ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে এসেছিল। ভেবেছি তুষার ঝঞ্ঝা থেকে যদি বা অব্যাহতি পেয়েছি, এই ঝড়ো বাতাসের কবল থেকে কোন মতেই রেহাই নেই। মৃত্যু নিশ্চিত।

কিন্তু ভগবানের অশেষ করুণা। অবশেষে দুর্যোগ কেটে গেছে। ভোরের দিকে উন্মাদ বাতাস ক্রমশঃ শান্ত হয়েছে। আশ্চর্য হলাম, যখন দেখলাম আমি বেঁচে আছি এবং আর সকলেও বেঁচে রয়েছে।

শুধু তা-ই বা বলি কেন? এখন আমরা এগিয়ে চলেছি পাঁচ নম্বর শিবিরের পথে।

কে বলবে গত রাতে আমাদের মাথার উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড়-ঝাপ্টা বয়ে গেছে! এখন কোথাও তার লেশমাত্র চিহ্ন অবশিষ্ট নেই! সত্যিই প্রকৃতির কী অদ্ভুত লীলাখেলা!

আজকের পথও বড়ই দুর্গম। গোড়ার দিকে বেশ খানিকটা উৎরাই। নরম তুষার জমে থাকার ফলে নামতে গিয়ে বেশ খানিকটা

হিমসিম খেতে হল। বারে বারেই পা হড়কে যেতে লাগল। ভয় হল, যদি ভারসাম্য ঠিক মত না রাখা যায় তা হলে পতন অনিবার্য।

একটি দড়িতে নিমাইদা, পাসাং শেরিং ও নিমা চলেছে। আর একটি দড়িতে ছুঞ্জে, সোনা এবং আমি। পরের দড়িতে পাসাং ফুতার ও শেরিং লাকপা আসছে। আমাদের পেছনে আসছে আরও ছ'জন শেরপা। সবার পিঠেই আজ অনেক মাল। রান্নার বাসনপত্র, কেরোসিন, স্টোভ এবং খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি।

পঞ্চম শিবির প্রতিষ্ঠার পরে শেরপারা সকলেই আজ আবার নিচে নেমে যাবে। যাবে পাসাং ফুতারও। বিশ্বদেবদা এবং তাপসদা আজ চতুর্থ শিবিরে আসবেন। পাসাং ফুতার আগামীকাল ওদের সঙ্গে আসবে।

চমৎকার আবহাওয়া। যতদূর দৃষ্টি যায় চারিদিকে শুধুই তুষার-মৌলি গিরিশ্রেণী। নিচে দেখা যাচ্ছে পূর্বিকামেট হিমবাহ। যেন এক চিলতে সরু চাদর। সর্পিল গতিতে এঁকে বেঁকে গিরিশ্রেণীর আড়ালে চলে গেছে। এখান থেকে দেখে মনেই হয় না ওর মধ্যে নানা ধরনের মৃত্যু-ফাঁদ পাতা রয়েছে!

শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। পিপাসাও পেয়েছে খুব। তাড়াতাড়ি পা ফেলে একটা ছোট্ট পাথরের ধারে এসে দাঁড়াই। ওয়াটার-বটল থেকে জল ঢেলে গলা ভেজাই। ইত্যবসরে পাসাং শেরিং ফ্লাস্ক খুলে গরম জল, চা আর গোটাকতক বিস্কুট খেতে দেয়।

বেশ লাগে খেতে। এটুকুর যেন প্রয়োজন ছিল এখন। শরীরটা আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

নিমাইদা বললেন—এবারে শুরু হবে আমাদের আরোহণের পালা। শুধু উঠব আর উঠব। ধ্রুবটা সঙ্গে থাকলে খুব ভাল হত, তাই না প্রাণেশ? ঝব্বু ওর পেছনে এনে দিলে কেমন মজা হোত বল তো? দেখতে, ঝব্বুর ভয়ে ধ্রুব উর্ধ্বশ্বাসে এগিয়ে যেতো। চড়াই উৎরাই থোরাই কেয়ার করত।

এত কষ্টের মধ্যেও নিমাইদার কথা শুনে হাসি পাচ্ছে।

বলতে যাচ্ছিলাম, ঝব্বু না হোক, অন্ততঃ ধ্রুবদাকে নিয়ে এলে যে খুব মজা হত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বললাম না। কথা বলা মানেই আরও হাঁপিয়ে পড়া।

নিমাইদা সামনে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলেন—এই দিক দিয়ে আমাদের উঠতে হবে।

আমার বুক শুকিয়ে যায়। কি সাংঘাতিক চড়াই! একটা বরফের প্রাচীর নাক বরাবর উঠে গেছে। কাঁচের মত স্বচ্ছ। নীলাভ। ৭০°-৮০° খাড়া হবে। রোদ লেগে চিক্‌চিক্ করছে। খালি চোখে তাকানো যায় না, ধাঁধা লাগে।

শুধু ক্লাইম্বিং বুট পায়ে এ পথে এগুনো অসম্ভব। তাই আমরা বুটের নিচে লোহার কাঁটার ক্র্যাম্পণ লাগিয়ে নিলাম।

পাসাং ফুতার প্রথমে এগিয়ে যায়। তুষার গাঁইতিতে ভর দিয়ে বুটের ডগা দিয়ে 'কিক' করে করে সে পা রাখার জায়গা তৈরি করে চলেছে। যেখানে তা পারছে না সেখানে তুষার গাঁইতির সাহায্যে বরফ কাটছে। নিচে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে শেরিং লাকপা একটু একটু করে দড়ি ছেড়ে 'বিলে' করছে তাকে।

কুড়ি-পঁচিশ ফুট আরোহণ করে পাসাং ফুতার এবার শক্ত হাতে ওপর থেকে বিলে করে শেরিং লাকপাকে। লাকপা তুষার গাঁইতিতে ভর দিয়ে উপরে ওঠে। পাসাং ফুতার যেখানে পা ফেলেছিল, সে-ও সেখানে সেখানে পা রেখে উঠে যায়। প্রয়োজনমত 'কিক' করে কিম্বা বরফ কেটে স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিকভাবে আরোহণের জন্য সিঁড়ির মত মজবুত ধাপ তৈরি করে।

আমরাও ঠিক একই পদ্ধতিতে ওদের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে আরোহণ করি। পর্বতারোহণের এটাই প্রচলিত বিধি। পুরোভাগে যাঁরা থাকেন, তাঁদের প্রভূত পরিশ্রম করে পথ তৈরি করতে হয়। পেছনে যারা আসে তাদের সেই নির্দিষ্ট পথে চলতে হয়। তাতে সময় বাঁচে, মেহনত হয় কম।

অবশ্য ক্রমাগত একটি দলই যে সর্বক্ষণ পথ তৈরী করে এগিয়ে যাবে, তা নয়। পালা করে করে এই কাজ করতে পারলে ভাল হয়। তা হলে অগ্রবর্তী দলের উপর মানসিক ও শারীরিক চাপ কম পড়ে।

পথের যেন শেষ নেই। উঠছি তো উঠছিই। শ্বাস-প্রশ্বাসের ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। তার উপরে এত পরিশ্রম, যেন হৃদযন্ত্রটাই ফেটে যাবে। ক্ষুৎপিপাসায় আর ঠাণ্ডায় শরীর ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে আসছে, সর্বাঙ্গ আমার থরথর করে কাঁপছে। এখন বিশ্রাম না নিলে আমি আর এক পা-ও এগুতে পারব না।

তীব্র বাতাস বইছে। তার সঙ্গে মিশে আছে তুষার-কণা। তাতে চোখ অন্ধ হবার যোগাড়। চোখে গগলস থাকার জন্য খানিকটা অবশ্য রেহাই পাচ্ছি। কিন্তু থাকলে কি হবে! গগলস-এ তুষার লেগে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে বারে বারেই। এই অবস্থায় এক-নাগাড়ে চলাও সম্ভব নয়। দমকা বাতাসের ঝাপটা পরিহার করার জন্য একটু পরে পরেই উটের মত ঘাড় গুঁজে আত্মরক্ষা করছি। প্রকৃতির এই নির্দয় কশাঘাত আর কতক্ষণ সহ্য করতে হবে কে জানে?

ন'ঘণ্টা চলার পর বিকেল তিনটে নাগাদ আমরা যেখানে এসে পৌঁছলাম, সেখান থেকেও পঞ্চম শিবিরের স্থান বেশ খানিকটা দূরে। আর মাঝখানে রয়েছে দুস্তর বাধা। প্রকাণ্ড উঁচু একটি আইস-ওয়াল পথ রোধ করে রেখেছে। এটার উপর দিয়ে না হোক্, পাশ দিয়ে 'ট্র্যাভার্স' করে যেতেও বিস্তর সময়ের দরকার।

অমানুষিক পরিশ্রমের জন্য দলের সকলেই অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন। শরীর আর বইছে না। খিদেও পেয়েছে প্রচণ্ড। বলতে গেলে দীর্ঘ ন ঘণ্টার মধ্যে আমাদের কারও পেটে কিছু পড়ে নি। বড় দুর্বল লাগছে। শেরপারা ছটফট করছে মাথার যন্ত্রণায়।

এই অবস্থার মধ্যে এগিয়ে যাবার কোন অর্থ হয় না। বরং তাতে পরিণাম মারাত্মক হতে পারে। এমন কি দুর্ঘটনা ঘটাও বিচিত্র নয়! তা ছাড়া বেলাও পড়ে এসেছে। শেরপারা যারা নিচে ফিরে

যাবে, তাদের এখন ছেড়ে না দিলে সন্ধ্যার আগে নিচের শিবিরে পৌঁছুতে পারবে না। সে-সব কথা চিন্তা করে নিমাইদা স্থির করলেন আজকে রাতটা আমরা এখানেই থাকব। কাল বরং পঞ্চম শিবিরের নির্দিষ্ট জায়গায় শিবির নিয়ে যাওয়া যাবে।

নিমাইদার সিদ্ধান্তকে সকলেই স্বাগত জানাল। বিশেষ করে শেরপারা শুনে খুবই খুশি হল। আমরা তাড়াতাড়ি আইস-ওয়ালের পাশে সংকীর্ণ জায়গাটিতে তাঁবু লাগালাম। আর এক মুহূর্তও দাঁড়াতে পারছি না। আগে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে শরীরটাকে গরম করতে হবে। পরে অন্য কথা।

॥ নয় ॥

ঘুম ভাঙতেই ঘড়ি দেখি। সাতটা বাজে। অভিযানে এসে এই প্রথম এত দেরিতে আমার ঘুম ভাঙলো। তবু উঠতে ইচ্ছে করছে না। সারা গায়ে দুঃসহ ব্যথা। গতকালের প্রচণ্ড পরিশ্রমের ফল।

কিন্তু এখনও বেড-টি আসছে না কেন? কোনদিন তো এত দেরি হয় না। শেরপারাও কি তা হলে ঘুমুচ্ছে? কিন্তু ছুঞ্জে তো এত বেলা অবধি ঘুমোবার মানুষ নয়। প্রতিদিন সে সাত-সকালে ঘুম থেকে উঠে পড়ে। গুন গুন করে মন্ত্র পাঠ করে খানিকক্ষণ—স্মরণ করে ভগবান তথাগতকে। তারপরে স্টোভ জ্বালায়, বরফ গলিয়ে জল তৈরি করে চা ও জলখাবারের জন্য। কিন্তু আজ তার মন্ত্রপাঠ শুনতে পাচ্ছি না। চারিদিকে কেমন একটা অস্বাভাবিক নীরবতা বিরাজ করছে।

নিমাইদারও কোন সাড়াশব্দ নেই। তিনিও ঘুমে অচেতন। কেবল আইস-ওয়ালের ওপর থেকে মাঝে মাঝেই টুপ্‌টাপ্‌ শব্দে জল পড়ছে তাঁবুর ওপর। এছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। ঘুম ভাঙলো নিমাইদার চিৎকার শুনে—ছুঞ্জে···নিমা···পাসাং শেরিং···লাকপা···

কিন্তু কারো সাড়া পাওয়া গেল না। নিমাইদা আবার একে একে সবাইকে ডাকলেন। তবু কেউ কোন উত্তর দিল না। পরিবর্তে শুধু নিমাইদার সে আহ্বান পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

—ওদের ডাকছেন কেন নিমাইদা? আমি জিজ্ঞেস করি। মোটে আটটা বাজে। বেচারীদের কাল ভয়ানক পরিশ্রম গেছে। আর একটু ঘুমিয়ে নিক। পরে বরং ডেকে দেওয়া যাবে।

—আটটা বাজে? তুমি কি স্বপ্ন দেখছো? না হাই অলটিচুড সিক্‌নেশে ভুগছে? নিমাইদা গোল গোল চোখ করে আমার দিকে তাকান।

—আমাকে নয়, আপনাকেই হাই অলটিচুড সিকনেশে ধরেছে নিমাইদা। এই দেখুন। বলে আমি আমার হাতঘড়িটা তার চোখের সামনে তুলে ধরি।

নিমাইদা সেদিকে তাকিয়েই হো হো করে হেসে ওঠেন। তাঁর প্রাণখোলা হাসির শব্দে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। নিমাইদা বলেন—আমি ভুল বলেছি প্রাণেশ! না, তুমি হাই অলটিচুড সিকনেশে ভুগছ না, ভুগছে তোমার ঘড়িটা।

—এ্যাঁ, তার মানে? তাড়াতাড়ি ঘড়িটা কানের কাছে ধরি। সে কি, ঘড়িটা যে বন্ধ হযে আছে!

চাবি দিতেই ঘড়ি আবার সচল হয়ে ওঠে। নিমাইদাকে জিজ্ঞেস করি—এখন ক'টা বাজে বলুন তো! ঘড়িটা মিলিয়ে নিই।

—একটা। নির্বিকারভাবে বলেন নিমাইদা।

—একটা! আমরা এখনও তাঁবুর মধ্যে! কখন গোছগাছ করব আর কখনই বা রওনা হব এখান থেকে!

—কিচ্ছু করার নেই প্রাণেশ। শেরপারা সবাই সিক্ হয়ে পড়েছে। কেউ মাথা তুলতে পারছে না।

—তা হলে কি হবে?

—আমি ওদের ওষুধ দিয়ে এসেছি। ছুঙ্গে চা তৈরি করছে। চা খেয়েই আমরা রওনা হব। ওঠ, প্যাক্ আপ।

—কিন্তু আপনার ডাক শুনে শেরপারা কেউ সারা দিল না কেন?

—হয়তো শুনতে পায় নি। বাইরে যা দমকা হাওয়া চলেছে…।

নিমাইদা বুটের লেস বাঁধতে বাঁধতে বলেন—একটু টয়লেট পেপার দাও তো।

—সে কি নিমাইদা? পেটে চা না পড়তেই…

—এখন কোন কথা নয় প্রাণেশ! শীগগির টয়লেট পেপার দাও! নইলে এখানেই হয়তো…

টয়লেট পেপার নিয়ে নিমাইদা একরকম ছুটেই বেরিয়ে যান তাঁবু থেকে।

চারিদিকে তুষার শৃঙ্গের প্রহরী। তারই মাঝে মানা—সুন্দরী মানা! নীল আকাশের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। যেন রাজঅন্তঃপুরে সখী পরিবৃতা গর্বিতা হিমালয়-দুহিতা। সবার মাঝে বিরাজ করেও সে স্বতন্ত্র। এক অনুপম স্বর্গীয় শোভা! এই সেই মানা—আমাদের নয়নের মণি! এত কাছে থেকে তাকে দেখতে পাব কল্পনাতেও কখনও ভাবি নি। আমি ধন্য।

শব্দহীন মহান্ নিস্তব্ধতা। নিচে—বহু নিচের উপত্যকা থেকে পুঞ্জিভূত মেঘ কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। কী অপরূপ দৃশ্য! সার্থক জন্ম আমার। আমি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখি।

হঠাৎ পাসাং শেরিং-এর অস্ফুট কণ্ঠস্বরে সম্বিত ফিরে আসে। সে বলছে—মা—মা—মা—বহত্ খত্রা ছ। মাতি যানে কো বাট ছই ন।

কাউকে বলছে না। নিজেই নিজেকে বলছে। বাইনাকুলার চোখে লাগিয়ে অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে পাসাং শেরিং মানাকে দেখছে আর বলে চলেছে—আরে বাপ্রে, কী সাংঘাতিক। চূড়ায় ওঠার কোন পথই তো দেখছি না।

জিজ্ঞেস করি—কি বলছ পাসাং ?

—প্রাণেশ সাব! মেরে খেয়াল মে 'টপ্' যানে কো লিয়ে কোই রাস্তা নহী মিলেগা। দেখিয়ে আপ, ইয়ে পিক্ বহুত্…!

বাকিটা সে আর বলে না। বাইনাকুলারটা চোখ থেকে নামিয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়। তার চোখেমুখে হতাশার চিহ্ন সুস্পষ্ট।

বাইনাকুলার চোখে লাগিয়ে আমি মানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি—সত্যিই ভয়াবহ। বীভৎস চেহারা। আপাত-দৃষ্টিতে যাকে অসাধারণ সুন্দরী বলে মনে হচ্ছে, বাইনাকুলারের পুরু লেন্সের মধ্য দিয়ে তার আসল চেহারাটি কিন্তু মোটেই তেমন নয়।

খাড়াই উত্তর-গাত্রের ঠিক নিচেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গহ্বর। দূর থেকে খালি চোখে এগুলো নজরেই পড়ে নি। বর্শার ফলার মত অসংখ্য 'আইস পিনাকেলস্' মানার গা থেকে ঝুলছে। তারা কিছুতেই আমাদের পথ দেবে না।

আর দেখতে পাচ্ছি অসংখ্য ফুটিফাটা—অনেকটা আলপনার মত দেখাচ্ছে। ওগুলো আসলে কিন্তু ক্রিভার্স—বরফের ফাটল। মাকড়সার জালের মত ঐ ফাটলগুলি কতদূর বিস্তৃত, তা এখান থেকে অনুমান করা শক্ত।

ফাটলের এলাকা ছাড়িয়েই শুরু হয়েছে খাড়া প্রাচীর। প্রায় ৯০° কোণ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার আগাগোড়া প্রায় কঠিন নীলাভ বরফে মোড়া। মাঝে মাঝে নগ্ন পাথরের আস্তরণ দেখতে পাচ্ছি। স্বর্ণাভ তার রঙ। সম্ভবতঃ প্রবল বাতাসের জন্য সেখানে তুষারের প্রলেপ লাগতে পারে নি।

দুধের সরের মত দেখাচ্ছে কোন কোন জায়গার বরফ। ঢেউ-এর পর ঢেউ হয়ে শিখরের কাছ থেকে ঝুলছে অসংখ্য বরফের চাঙড়। ওগুলো আসলে তুষারস্তূপ। মোটা মোটা বেঢপ বিসদৃশ্য চেহারা। সামান্য বাতাস কিম্বা রোদের উত্তাপেই ভেঙে পড়বে।

শিখর ত্রিভুজাকৃতি। শীর্ষদেশে ঠিক কতখানি জায়গা আছে,

এখান থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে শিখর থেকে লম্বা একটি শিরা (Ridge) ক্রমশঃ ঢালু হয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে নেমে গেছে। প্রায় আধ মাইল লম্বা সেই শিরাটি গিয়ে মিশেছে একটি আইস-ওয়ালে। গিরিশিরাটি দেখতে অনেকটা উটের ঘাড়ের মত। আর তার উপরি ভাগ ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ। এই সংকীর্ণ গিরিশিরার উপর দিয়ে শিখরারোহণের প্রচেষ্টা চালানো সম্ভব হবে কিনা জানি না। তবে মনে হচ্ছে, এর উপর দিয়ে চলার সময় শরীরটা কোন কারণে একটু দক্ষিণে হেলে গেলে আর রক্ষে নেই—একেবারে সোজা কয়েক হাজার ফুট নিচে বাঙ্কে হিমবাহে নিয়ে ফেলবে।

ধরা যাক, তেমন দুর্ঘটনা ঘটবে না। তা হলেও কিন্তু সোজাসুজি এই গিরিশিরা ধরে শীর্ষারোহণ সম্ভব নয়। এখান থেকে যেটুকু দেখতে পাচ্ছি, তাতে মনে হচ্ছে এই শিরাটি মোটেই চলবার উপযোগী নয়। মাঝে মাঝেই বেশ বড় বড় গহ্বর রয়েছে। মনে হচ্ছে এ্যালুমিনিয়াম ল্যাডার ফেলেও পার হওয়া যাবে না।

সবচেয়ে বড় কথা, বাধা-বিপত্তিগুলো যদিও বা কোন মতে এড়ানো সম্ভব হয়, তা হলেও কি একদিনে শিখরে আরোহণ করে নিচের শিবিরে ফিরে আসা সম্ভব হবে?

তুষার তো নয় কেউ যেন টন টন ময়দা ফেলে রেখেছে। হাঁটু সমান উঁচু সেই ময়দার নরম তুষারের ওপরে যেন ধান মাড়াই চলেছে। শেরপারা পা দিয়ে উঁচু জায়গাগুলোকে সমতল করছে। নইলে যে ওখানে তাঁবু লাগানো যাবে না।

একষট্টি সালেও এখানেই পঞ্চম শিবির ছিল। সেবার এই শিবির স্থাপন করতে অভিযাত্রীদের প্রভূত পরিশ্রম করতে হয়েছিল। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাঁরা দিনের পর দিন পথ খুঁজে এই জায়গাটি বের করেন।

সেদিক থেকে বিচার করলে এবারে শিবির স্থাপন করতে খুব বেশি বেগ পেতে হয় নি। প্ল্যান অনুযায়ী সামান্য কম-বেশি উঁচুতে

প্রায় প্রতিটি শিবিরই স্বল্প আয়াসে, অত্যন্ত কম সময়ের ব্যবধানে লাগানো সম্ভব হয়েছে। এই সাফল্যের কারণ—পূর্ব অভিজ্ঞতা। পথের বাধা-বিপত্তিগুলো জানা থাকার ফলে আমাদের কাজ -অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে।

কাজেই আমাদের পূর্ব-সূরীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবারকার অভিযানে সবিশেষ সাহায্য করেছে। তাঁদের কাঁধের ওপর পা রেখেই আমরা আজ এখানে—২২,৮০০ ফুট উঁচুতে, এই মানা অভিযানের শিখর শিবিরে।

শিবিরের এই স্থানটি বড়ই অদ্ভুত। মনে হয় বাইশ হাজার ফুটের উপরে এ যেন একটি বরফাবৃত সমতল ময়দান। আসলে কিন্তু তা নয়। এটি একটি 'বেসিন।' প্রায় সিকিমাইল লম্বা। চওড়াও প্রায় তাই। উত্তর-পশ্চিম দিকে, বেসিনের প্রান্তভাগে, মানার উত্তুঙ্গ খাড়াই প্রাচীর উঠে গেছে।

চা খেয়ে এয়ার-ম্যাটট্রেস বিছিয়ে নেবার তোড়জোড় করছি। এমন সময় কতগুলো অপরিচিত কণ্ঠস্বর কানে ভেসে এল! তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে আসি তাঁবু থেকে। দেখি চতুর্থ শিবির থেকে কয়েকজন শেরপা এসেছে। তাদের পিঠে ভারি বোঝা। তারা পথশ্রমে প্রচণ্ড হাঁপাচ্ছে।

আমাকে দেখে তারা চোখের কালো গগলস খুলে নিঃশব্দে হাসে। তারপর এক বুক বাতাস টেনে জিজ্ঞেস করে—রাম রো সাব (ভাল তো সাহেব)?

—রাম রো (ভাল)। তিম্‌রো (তোমরা কেমন)? আমি জানতে চাই।

—একদম রাম রো, সপ্পাই (খুব ভাল, সকলে)। জবাব দেয় শেরপা সর্দার।

ভাল লাগে ওদের কথা। আমি এগিয়ে গিয়ে প্রত্যেকের সঙ্গে আলিঙ্গন করি। পিঠ চাপড়ে বলি—সাবাশ!

ওরাও খুশি হয়। সকলেই পিঠ থেকে মালপত্র নামিয়ে রাখে বরফের ওপর। এ্যালুমিনিয়াম ল্যাডার, দড়ি, পিটন, তাঁবু, অক্সিজেন-সিলিণ্ডার ছাড়াও বেশ কিছু রসদ এনেছে ওরা। এর প্রত্যেকটি জিনিসই এখানে অপরিহার্য ও অত্যন্ত মূল্যবান। এবারে তারা মানার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে আমাদের ইপ্সিত শিখরকে। দেখতে দেখতে পরস্পর কি যেন আলোচনা করে নেপালী ভাষায়। তারপর একসময় আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সর্দার বলে—ইয়ে পিক্ ক্লাইম্ব হো যায়েগা। খানা-পিনাকে লিয়ে ফিকির মৎ কিজিয়ে। হম্ লোগ পুরা মদত্ দে দেঙ্গে। রাস্তা ঢুরকে জরুর ক্লাইম্ব করনা চাহিয়ে। বলতে বলতে সর্দারের চোখ দু'টি চক্‌চক্ করে ওঠে।

তার কথা শুনে আনন্দে আর উত্তেজনায় আমার সারা শরীর কাঁপতে থাকে। কি বলে যে ওকে কৃতজ্ঞতা জানাবো ভেবে পাই না।

সত্যি, শেরপা আর লকুলদের কাজের কোন তুলনা হয় না। দিনের পর দিন রোদ, বরফ আর হিমশীতল বাতাস উপেক্ষা করে এক শিবির থেকে আরেক শিবিরে মালপত্র বয়ে চলেছে। রোদে ও বরফে জ্বলে ওদের মুখমণ্ডল কালো হয়ে গেছে। চামড়া গেছে কুঁচকে। নাকের ডগায় বিশ্রী ঘা হয়েছে অনেকের। তবু তার জন্য কোন আফশোস নেই। নেই কোন ক্লান্তি, বা অবসাদ। বরং প্রবল উৎসাহের সঙ্গে জীবনপণ সংগ্রাম করে চলেছে আমাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে। প্রায় প্রত্যেক পর্বতাভিযানেই ওরা এমন করে। কিন্তু ইতিহাসে সেকথা বড় একটা লেখা হয় না।

—মেম্বার কৌন্ কৌন্ আরাহা সর্দার?

—বড়া সাব আউর তাপস সাব···

—ব্যস?

—জী সাব।

ছুঙ্গে আর পাসাং শেরিং ওদের জন্য গরম চা আর বিস্কুট নিয়ে আসে। চা খেয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ওরা আবার নিচের শিবিরে ফিরে চলে।

কিছুক্ষণ বাদেই বিশ্বদেবদা আর তাপসদা এলেন। সঙ্গে এসেছে পাসাং ফুতারও। আমরা ওদের দেখে খুব আনন্দিত হই। অনেকদিন পরে যেন আবার এক জায়গায় মিলিত হয়েছি। হাসিখুশিতে ভরে উঠল পঞ্চম শিবির। তারপর যথারীতি অভিযানের প্রসঙ্গ ওঠে। পরবর্তী কর্মসূচী নির্ধারণ করতে নেতা আর সহনেতা আলোচনায় বসেন।

অভিযানে বেরিয়ে আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। মূল শিবিরে 'ডাক' এসেছে যোশীমঠ থেকে। তাতে আমার খানকতক চিঠিও এসেছে। বিশ্বদেবদার কাছ থেকে চিঠিগুলো নিয়ে আমি ফিরে আসি আমার তাঁবুতে। ছুঙ্গে আর পাসাং শেরিং-এরও চিঠি এসেছে। তারা তাদের চিঠিগুলো নিয়ে আমার তাঁবুতে এসে ঢোকে। ওরা লেখা-পড়া জানে না। অতএব নিজের চিঠি পাশে রেখে ওদের চিঠি হাতে নিই।

॥ দশ ॥

যত দূর দৃষ্টি যায় কেবল পাহাড় আর পাহাড়। তাদের কোনটি ত্রিভুজাকৃতি, কোনটি গোল, আবার কোনটি বা ছুঁচলো। একটির সঙ্গে আরেকটির কোন সাদৃশ্য নেই। প্রত্যেকেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রক্তপলাশী রঙ্ ঠিক্‌রে পড়েছে ঐ সব ধ্যানগম্ভীর তুষারধবল শিখরে। মনে হচ্ছে, কে বা কারা যেন লাল আবির লেপে দিয়েছে। আমি তন্ময় হয়ে দেখছিলাম। হঠাৎ পাসাং ফুতারের ডাকে সম্বিত ফিরে আসে—সাব, আভি চলিয়ে।

আজ আমরা দু'টি দল মানা শিখরের সম্ভাব্য পথ খুঁজতে চলেছি। নিমাইদা, ছুঙ্গে আর আঙ নিমা চলে গেছে উত্তর-পূর্বের গিরিশিরার দিকে। আর আমরা চলেছি উত্তর-পশ্চিমে। সোজাসুজি শিখরের পথ খুঁজে বের করবার চেষ্টা করব।

আমরা দু'টি দড়িতে চলেছি। একটিতে পাসাং ফুতার আর আমি। অপরটিতে পাসাং শেরিং ও লাকপা।

পাসাং ফুতার সবচেয়ে হুঁশিয়ার শেরপা। তাই সে আগে আগে যাচ্ছে। প্রতি পদক্ষেপেই তুষার গাঁইতি দিয়ে বরফ ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করছে। নিঃসন্দেহ হলে এগিয়ে যাচ্ছে।

এক জায়গায় বেশ কয়েকটা বড় বড় ফাটল পার হতে হল। এগুলো অত্যন্ত বিপজ্জনক। রোদের তেজ যত বাড়বে, এগুলি তত বেশি চওড়া হবে। পাসাং শেরিং লাল নিশান পুঁতে জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করে রাখল।

সত্যি কথা বলতে কি, আপাতদৃষ্টিতে বেসিনটাকে যতখানি নিরাপদ ভেবেছিলাম আসলে তা কিন্তু মোটেই ঠিক নয়। এর অনেক জায়গাতেই নিচে একেবারে ফাঁপা। ওপরে শুধু একটা পাতলা বরফের আস্তরণ। খালি চোখে বোঝা শক্ত। পা ফেলার আগে বরফ যাচাই করে না নিলে দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী।

বেসিনের প্রান্তভাগের বরফ অপেক্ষাকৃত কঠিন। এখানে আগাগোড়া প্রায় জুতোর ডগা দিয়ে 'কিক্' করে করে এগোতে হল। মাঝে মাঝে দু'চারটে ধাপও কাটতে হল।

দীর্ঘ তিন ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আমরা মানার পদপ্রান্তে হাজির হলাম। দশ-পনের মিনিট বিশ্রাম নিয়ে আবার পথচলা শুরু হল। একটু এগোতেই এক বিরাট গভীর খাদ। তার পশ্চিম-পারে ভাঙাচোরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের চাঁই। সমুদ্র-ঢেউ-এর মত দেখাচ্ছে। বটের ঝুড়ির মত অজস্র সরু সরু বরফের মালা ঝুলছে তার গা থেকে। আর সেগুলি থেকে ফোঁটা ফোঁটা

করে জল চুইয়ে পড়ছে। রৌদ্রকিরণে কিন্তু ওদের ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।

অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে আমরা খাদটাকে বাঁয়ে রেখে ডান দিকে ঘুরে গেলাম। কংক্রিটের মত শক্ত এখানকার বরফ। তা ছাড়া বেশ খাড়াই পথ। জুতোর নিচে ক্র্যাম্পন বেঁধে ধাপ কেটে কেটে উঠতে হচ্ছে আমাদের।

অত্যন্ত খাড়াই পথ। এ পথে আরোহণ করা যদি বা সম্ভব, অবরোহণ করা প্রায় অসম্ভব। যে-কোন সময় পা ফসকে যেতে পারে। তাই এ পথে স্থায়ীভাবে দড়ি লাগানো অর্থাৎ 'ফিকসড রোপ' করা একান্ত প্রয়োজন।

পাসাং ফুতার হাতুড়ির ঘা মেরে কিছু দূর অন্তর অন্তর পিটন পুঁতে দড়ি লাগিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে সামনে। আর আমরা সেই দড়ি ধরে ধাপে পা রেখে রেখে উপরে উঠতে থাকি।

ঘণ্টা তিনেকের পরিশ্রমে শ'দেড়েক ফুট দড়ি লাগানো সম্ভব হল। আমরা ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহে 'কল'-এ (col) উঠে এলাম। এখানে অপ্রশস্ত গিরিশিরাটি এসে মানার গায়ে মিশেছে।

'কল' থেকে বেরিয়ে কুড়ি-পঁচিশ ফুট উঠতেই সামনে পড়ল একটি পাথরের দেওয়াল। আমরা এটাকে এড়িয়ে যাবার জন্য অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু সম্ভব হল না। এর উপর দিয়েই উঠতে হবে।

পাসাং ফুতার আর শেরিং লাকপা গেল এগিয়ে। প্রচুর মেহনত করে ওরা পিটন পুঁতে দড়ি লাগাবার চেষ্টা করতে লাগল। হাতুড়ির ঠুং ঠাং আওয়াজে নির্জন বরফাবৃত প্রান্তর মুখর হয়ে উঠছে। আমি আর পাসাং শেরিং একঠায় দাঁড়িয়ে নিচের থেকে তাদের বিলে করছি।

দড়ি লাগানো পরের কথা। ওরা পিটন পুঁততেই পারছে না—নাস্তানাবুদ হচ্ছে। অত্যন্ত নরম পাথর। হাত-পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই হলদে চাঙড় উঠে আসছে।

তবু ওরা হাল ছেড়ে দেয় না। আপ্রাণ চেষ্টার ফলে সফল হয়। তবে মাত্র পঞ্চাশ ফুট ফিকসড রোপ লাগাতে দু'ঘণ্টারও বেশি কিছু সময় লেগে গেল।

আমরা শিবিরে ফিরে এলাম। এসে শুনলাম নিমাইদারা গিরিশিরা দিয়ে মানা আরোহণের কোন সম্ভাব্য পথের হদিশ করতে পারে নি। তাঁরা ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে।

বিশ্বদেবদার কাছে আরো জানতে পারলাম, দুপুরের দিকে রসদ নিয়ে নিচে থেকে কয়েকজন শেরপা এসেছিল। নিমাইদা আর আঙ নিমা তাদের সঙ্গে নিচে নেমে গেছে।

পরের দিন আবার পাসাং ফুতার, শেরিং লাকপা এবং পাসাং শেরিং রাস্তা খুঁজতে গেল। বিশ্বদেবদা আর তাপসদাও সঙ্গে গেলেন। সারাদিন বিস্তর পরিশ্রম করে আরো শ'তিনেক ফুট দড়ি লাগিয়ে শেরপা তিনজন বিকেলের দিকে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করল। শুনে আমরা আনন্দে আত্মহারা হই। নেতা ঘোষণা করেন—আগামী কালই শীর্ষ আরোহণের চেষ্টা করা হবে।

কিন্তু বিধি বুঝি আমাদের এই কথা শুনে অলক্ষ্যে হেসে থাকবেন। হেসে থাকবে ছলনাময়ী মানাও। রাত ন'টার পরে হঠাৎ নির্মেঘ আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। শুরু হল তুষারপাত। তাঁবুর ওপর থেকে রাশি রাশি তুষার ঝাড়তে ঝাড়তে আমরা হাঁপিয়ে উঠলাম।

প্রদ্যোৎদা আজ বিকেলেই নিচের থেকে এখানে এসেছেন। তিনি আমার পাশেই বসেছিলেন। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে তিনি অস্ফুটস্বরে বললেন—একেবারে হুবহু একষট্টি সালের ঘটনা।

১৮ই সেপ্টেম্বর। শিবিরে বসে প্রাতঃরাশ সারছিলাম। শেরপা আঙরিতা একটু আগে এনামেলের থালায় করে দু'খানা চামড়ার মত

শক্ত পরোটা, খানিকটা মেটে ভাজা, পর্ক ও লঙ্কার চাটনি দিয়ে গেছে। সহসা চারিদিকের নিস্তব্ধতা ভেদ করে একটা প্রচণ্ড শব্দ উঠল। মনে হল অনেকগুলি কামান যেন একসঙ্গে গর্জে উঠল। তার তীব্র ধ্বনি চারিপাশের তুষারশুভ্র গিরিগাত্রে প্রতিধ্বনিত হয়ে আকাশ বাতাস ব্যাকুল করে তুলল। তা হলে কি সুন্দরী মানার গা থেকে ভয়ঙ্কর তুষার ধস্ ভেঙে পড়ল?

তাপস ভট্টাচার্য ও তিনজন শেরপাকে সঙ্গে নিয়ে গতকাল নেতা এখান থেকে রওনা হয়ে গেছেন। তাঁরা মানার ভয়াবহ উত্তর-পশ্চিম গাত্রের ঠিক নিচে একটি শিখর-শিবির প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্থির হয়েছে, আবহাওয়া ভাল থাকলে আজ ঐ শিবির থেকে তাঁরা চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন।

আগে অবশ্য এ ধরনের কোন পরিকল্পনা ছিল না। ঠিক ছিল—পঞ্চম শিবির থেকেই শিখরাভিযান করা হবে। সেইভাবে আমরা প্রস্তুত হয়েছিলাম। কিন্তু প্রকৃতি বাদ সাধল। তুষারপাত সমস্ত পরিকল্পনাকে পাল্টে দিল। তিনদিন ধরে অবিরাম তুষারঝঞ্ঝা ও তুষারপাতের ফলে আমাদের অমানুষিক শ্রম দিয়ে গড়া পথ তুষারে চাপা পড়ে গেছে। পঞ্চম শিবির ও মানার উত্তর-গাত্রের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ তুষারাবৃত প্রান্তরে মানুষ—সমান উঁচু নরম তুষার জমেছে। অক্সিজেনের স্বল্পতাহেতু যেখানে উঠতে-বসতে ফুসফুসের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে, সেখানে তুষারকাদা ভেঙে এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে শীর্ষারোহণ অবাস্তব ও অসম্ভব। তাই ওঁরা কাল ঐ বিপজ্জনক পথটুকু অতিক্রম করে শীর্ষারোহণ শিবির এগিয়ে নিয়ে গেছেন, যাতে শিখরাভিযানের দিন অভিযাত্রীরা অযথা পরিশ্রান্ত না হয়ে পড়েন।

প্রাতঃরাশের থালাটা তাঁবুর ছোট্ট দরজা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিই। তাড়াতাড়ি 'ক্যাম্পস্' পরে বাইরে বেরিয়ে আসি। পাসাং শেরিং, আঙরিতা আর ছুপ্পেও হাতের কাজকর্ম ফেলে বাইরে ছুটে এসেছে। তাদের চোখেমুখেও দুশ্চিন্তার ছাপ। তা হলে কি

আমার অনুমান মিথ্যে নয়? সবাই তাকিয়ে আছে সামনে—যেদিকে ঐ মহাপ্রলয় ঘটে গেছে। কিন্তু কেউ কিছু দেখতে পাচ্ছে না। চারিদিক ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন। একহাত দূরের জিনিসও নজরে আসছে না। সুন্দরী মানা কুয়াশার ওড়নায় তার মুখখানি লুকিয়ে রেখেছে।

আমাদের কি কর্তব্য? শীর্ষারোহণ শিবিরের সহযাত্রীরা কেমন আছেন? গুঁড়ি গুঁড়ি তুষার পড়ছে। আমরা এগিয়ে •যাব কি?

শেরপারা যেমন নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দেই আবার তাঁবুতে গিয়ে ঢোকে। আমি একা দাঁড়িয়ে থাকি তাঁবুর সামনে। ভাবতে থাকি সহযাত্রীদের কথা। আর ঐ অজানা তুষার ধ্বসের কথা।

তুষার ধ্বসের কবলে পড়ে বহু পর্বতাভিযাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে জার্মান পর্বতাভিযাত্রীদের বিখ্যাত নাঙ্গা পর্বত (২৬,৬২০ ফুট) অভিযানের কথা। গভীর রাত্রিতে অভিযাত্রীরা যখন তাঁবুর ভেতরে ঘুমে অচেতন, হঠাৎ পর্বতশৃঙ্গের বিস্তৃত এলাকা তাঁবুর ওপরে ভেঙে পড়ল। পরে বরফের স্তূপ সরিয়ে উদ্ধারকারীরা বহু কষ্টে নিহত অভিযাত্রীদের হিমশীতল দেহ খুঁজে বার করেন।

আমার চিন্তায় ছেদ পড়ে। দূর থেকে যেন একটা অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। শেরপারা বেরিয়ে আসে বাইরে। আমরা উৎকর্ণ। রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করি। যদি আর একবার শব্দটা শুনতে পাই। পেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিষ্কার শুনতে পেলাম। কেউ আমাদের ডাকছে—পা—সা—ও···প্রা—ণে—শ—সা—ব।

আমরা অধীর আগ্রহে শব্দটা অনুধাবন করার চেষ্টা করি। তারা আরো কি যেন বলছে। কিন্তু বুঝতে পারছি না।

তবে কি আমার অনুমান সত্য? সত্যিই কি ওদের কোন বিপদ হয়েছে? ওরা কি তুষার ধ্বসের কবলে পড়েছে?

অজানা আশঙ্কায় বুকটা কাঁপতে থাকে। আজ ছ'দিন হল আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে পঞ্চম শিবিরে রয়েছি। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে নিচের শিবিরে নেমে যাওয়াই শ্রেয়। কিন্তু সে পথ রুদ্ধ। দড়ি লাগিয়ে ধাপ কেটে আরোহণ-অবরোহণের জন্য যে নিরারদ পথ তৈরি করা হয়েছিল, তা তুষারপাতে চাপা পড়ে গেছে। আলগা নরম তুষার জমে সে পথ ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। সুতরাং নিচে নামতে হলে এখন জীবনের ঝুঁকি নিতে হবে।

আবার সেই শব্দ। এবারে আরো স্পষ্ট। কিন্তু আমি চমকে উঠি। এ যে করুণ আর্তচিৎকার! মৃত্যুপথযাত্রীর আকুল আহ্বান কি?

আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি। আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। শেরপাদের এগিয়ে যেতে বলি। আমি ওদের অনুসরণ করি।

কুয়াশাচ্ছন্ন পথ। গুঁড়ি গুঁড়ি তুষারপাত অব্যাহত। বাতাসের বেগও বেড়েছে। আমরা তুষারকাদা ভেঙে অগ্রসর হচ্ছি। জানি না কখন ওদের সঙ্গে দেখা হবে। জানি না ওরা কেমন আছে। এলোমেলো নানা দুশ্চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়ছি। আমি বুঝি পাগল হয়ে যাব।

চমকে উঠি। ছায়ার মত কি একটা দেখা যাচ্ছে। মানুষ কি? হ্যাঁ, তাই তো? মানুষ। আমার সহযাত্রী। কে? পাসাং ফুতার? কিন্তু সে একা কেন? আর সকলে কোথায়? আমার দেহের রক্ত হিম হয়ে আসে। ভাবলাম ছুটে এগিয়ে যাই তার কাছে। জিজ্ঞেস করি সঙ্গীদের কথা। কিন্তু পারলুম না। না জানি কি শুনতে হবে!

ধীরে ধীরে পাসাং কাছে আসে। একদিনের ভেতর সে যেন শুকিয়ে গেছে। তাকে বড় বেশি রুগ্ন ও ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আমি তাকে জড়িয়ে ধরি। জিজ্ঞেস করি—কি খবর পাসাং?

কোন জবাব দেয় না সে। বোধ করি পারে না। অস্ফুটস্বরে শুধু বলে—জল, একটু জল।

আমরা ফিরে আসি তাঁবুতে। পাসাং শুয়ে পড়ে এয়ার ম্যাট্রেসের উপর। আমি তাকে জল এনে দিলুম। এক চুমুকে মগের জল নিঃশেষ করে সে আবার শুয়ে পড়ে। চোখ বোজে। তবে কি আর কেউ নেই?

না, না, তা হতে পারে না। পাসাং একটু সুস্থ হলে নিশ্চয়ই বলবে। কিন্তু কখন বলবে? কি বলবে? আমার মন মানছে না। আমার বুকের ভেতর তোলপাড় করছে—ওরা কোথায়? আমাদের নেতা বিশ্বদেব বিশ্বাস, সহযাত্রী তাপস ভট্টাচার্য। আর প্রিয় শেরপা শেরিং লাকপা ও গ্যালজেন।

কিন্তু কে সে প্রশ্নের জবাব দেবে? পাসাং ফুতার যে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি একবার তাঁবুতে আসছি, একবার বাইরে বেরুচ্ছি। অনেকক্ষণ কেটে যায়। কিন্তু কেউ আসে না, আসে না আমার সহযাত্রীরা। তা হলে নিশ্চয়ই মারাত্মক কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমি কি করব? কোথায় যাব? আমি যে একা।

মনে হচ্ছে মানুষের কণ্ঠস্বর। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে আসি। আমি উৎকর্ণ হয়ে থাকি। হ্যাঁ, শব্দটা বাড়ছে। ক্যাঁচ, ক্যাঁচ। নরম বরফের উপর দিয়ে হেঁটে আসার শব্দ। এবারে দেখাও যাচ্ছে কয়েকটি বিন্দু। অদূরেই। আমি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সেদিকে ছুটে চলি। হ্যাঁ এসেছে। ওরা ফিরেছে।

—বিশ্বদেবদা, তাপসদা, শেরিং লাকপা আর গ্যালজেন। তুষার গাঁইতিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে তাঁরা এগিয়ে আসছেন।

কিছুক্ষণ পরে। গরম কফির মগে চুমুক দিতে দিতে শুনি ওদের কথা। বলেন বিশ্বদেবদা আর তাপসদা। বলেন তুষার ধসের কাহিনী। জাগ্রত যৌবনের স্বপ্নকে নিষ্ফল করার জন্য ছলনাময়ী মানা আঘাত হেনেছিল। শীর্ষারোহণ-শিবিরের উপর একটি তুষারধস্ নামিয়ে দিয়েছিল। সে আমাদের শক্তি পরীক্ষা করেছে। আমরা সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি।

বিশ্বদেবদা বলেন—গতকাল শিবির প্রতিষ্ঠার পরে আমরা সকলেই তাঁবুতে বসে চা খাচ্ছি আর শিখরের দিকে তাকাচ্ছি। মনে হল শিখর যেন হাতের মুঠোয়। অকস্মাৎ গোধূলির ম্লান আলোতে একটি তুষার ধস্ ভেঙে পড়ল। কিন্তু সে ধস্ তাঁবুকে স্পর্শ করতে পারে নি। উত্তর-গাত্রের ঠিক নিচেই গভীর খাদে পড়ে তা নিমেষে অবলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু সাবধানের মার নেই ভেবে আমরা কাল সারারাতই বসে বসে কাটিয়েছি। আশেপাশে কোথাও তুষার ধসের শব্দ শুনলেই ছুটে বেরিয়ে পড়েছি আত্মরক্ষার জন্য। এই ভাবে আমাদের রাত কেটেছে।

—রাত পোহালো। আমরা তখন তাঁবুতে। চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। শেরপারা চা তৈরি করছে। তাপস ক্লাইম্বিং সু পরছে। আমি ক্যামেরা নিয়েছি, আর ঠিক তখনই তাঁবুর ঠিক পাশে সমুদ্র গর্জনের মত বিপুল শব্দে ভেঙে পড়ল তুষার ধস্। আমরা হতবাক্, বিহ্বল, বিমূঢ়। ভগ্নতুষারস্তূপ খান খান করে ভেঙে আছড়ে পড়ছে তাঁবুর ওপর। মনে হল আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছি। আমাদের দৃষ্টির সামনে থেকে পৃথিবী মুছে যাচ্ছে।

—শেরপাদের চিৎকার করে ডাকলাম। সাড়া নেই। ছিটকে বেরিয়ে এলাম বাইরে। তাপসও কালবিলম্ব না করে বেরিয়ে এল। তুষারচাপা পড়ল তাঁবু। গুঁড়ি গুঁড়ি তুষারকণা ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। মনে হচ্ছিল দম বন্ধ হয়ে মারা যাব।

—তারপর কতগুলি চরম মুহূর্ত কেটেছে। আমার বুকে চোট লেগেছে। ওরাও সকলে তখন অল্পবিস্তর আঘাতে দিশেহারা। শেরপারা তুষারস্তূপের ভেতর থেকে মালপত্র বের করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। তবে তার জন্য আমাদের কোন ক্ষোভ নেই। ক্ষোভ শুধু, মানার তুষারধবল শিখরে নতজানু হয়ে আমরা তাকে আমাদের প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করতে পারলাম না।

পাশেই বসেছিল গ্যালজেন। অত্যন্ত আমুদে ও অদ্ভুত প্রকৃতির

এই মানুষটি এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি। সে-ও দুর্ঘটনার সাক্ষী। কিন্তু তার মুখ-চোখ দেখে তা একটুও বোঝার উপায় নেই। চুপচাপ বসে বসে সে সিগারেট টানছিল। সে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন। বাংলা সে একদম বলতে পারে না, বোঝেও না। কিন্তু যেই না বিশ্বদেবদা থামলেন, অমনি সে ফস্ করে হাসতে হাসতে বলে উঠল—সাব হিমল মে এ্যাইসা হামেশা হোতা হ্যায়। ঘাবড়াও মৎ। দোসরা দিন ফির্ মওকা মিল যায়েগা।

অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে কথাগুলো বলেই সে আবার সিগারেটে মনোনিবেশ করে। তার এই নির্বিকার ভাব দেখে বিস্মিত হই।

তাপসদাও হাসতে হাসতে বলেন—ব্যাটা একেবারে বদ্ধ পাগল। ধস্ নামার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁবু থেকে বেরিয়ে প্রাণভয়ে এদিক ওদিক পালাবার চেষ্টা করছি, ও তখন তাঁবুতে বসে বসে স্টোভে পাম্প করছে। অনেক চিৎকার করে ডেকেও ওকে কিছুতেই বের করতে পারলাম না। অবশেষে তাঁবু যখন চাপা পড়বার উপক্রম তখন দেখি গর্ত থেকে শেয়াল বেরুনোর মত খাবলা খাবলা করে তুষার সরিয়ে বাবু পা দু'টি বের করছেন। সবচেয়ে আশ্চর্য কি জানিস, তাঁবু থেকে ও যখন বেরিয়ে এলো, তখনও ওর হাতের মুঠোয় সেই কেত্‌লি। আমরা তখন ভীষণ ক্লান্ত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছি। ও কিন্তু ভস্ ভস্ শব্দ তুলে তুষারকাদা ভেঙে এগিয়ে এল কাছে। তারপর একগাল হেসে কেত্‌লিটা উপুড় করে বলে—গির গিয়া সাব। এক মিনিট টাইম মিলনেসে হম্ পুরা চায়ে নিকাল কে লে আনে সক্‌তা।

॥ এগারো ॥

বিশ্বদেবদার বুকে আঘাত লেগেছে। পাঁজর ভেঙেছে কিনা বুঝতে পারছি না। গতরাতে তিনি একটুও ঘুমুতে পারেন নি। যন্ত্রণায়

সারারাত চিৎকার করেছেন। অসহ্য সেই দৃশ্য। চোখে দেখা যায় না।

গতকালই আমরা তাঁকে নিচে নেমে যেতে বলেছিলাম। একে তো এই ঠাণ্ডায় কষ্ট পাওয়ার কোন মানে হয় না। তার ওপর যদি কিছু একটা বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে তা হলে চিকিৎসার জন্য দীপককে তাড়াতাড়ি এখানে নিয়ে আসার কোন ভরসা নেই। অথচ গতকাল আবহাওয়া দুপুরের পরে মোটামুটি ভাল ছিল। তাপসদা আর ছুঞ্জে যখন নেমে গেল, তখন তিনিও তাদের সঙ্গে অনায়াসে নেমে যেতে পারতেন।

মনটা আমার ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। একের পর এক সমস্যা আমাদের যে কি ভাবে নাস্তানাবুদ করে চলেছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। খাবার-দাবারের বড়ই টানাটানি। চা, কফি, চিনি, দুধ, বিস্কুট ইত্যাদি নিঃশেষপ্রায়। আটা, চাল, ঘি, নুন, মশলাপাতি, টিনের মাছ ও মাংসের অবস্থাও তথৈবচ। খুব বেশি হলে টেনেটুনে আর দু'দিন চলবে। থাকার মধ্যে আছে কেবল কেরোসিন। কিন্তু দুটো স্টোভের একটা খারাপ হয়ে গেছে। বাকিটাও এখন যাই যাই করছে। যে-কোন মুহূর্তেই তা বিকল হয়ে যেতে পারে। অতি কষ্টে, সাবধানে তাকে জ্বালানো হচ্ছে। ভগবান না করুন, এখন যদি এই স্টোভটা খারাপ হয়ে যায়, আর দু' তিন দিন ধরে তুষারপাত চলতে থাকে, তা হলে আমাদের চরম বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। পিপাসা পেলে সামান্য এক ফোঁটা জলও তখন আমরা খেতে পারব না। না, ভেবে কোন লাভ নেই। যা হবার তা হবেই। গৌরবময় অনিশ্চয়তাই পর্বতারোহণের প্রধান উপজীব্য।

আজ সোমবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর। ঠিক একমাস হল আমরা কলকাতা থেকে বেরিয়েছি। উন্মত্ত ঝড়, প্রমত্ত হিমপ্লাবন, নিষ্ঠুর তুষারপাত আমাদের অগ্রগতিকে যদি ব্যাহত না করত, তা হলে আমরা এতদিনে মানা আরোহণ করে এগিয়ে যেতে পারতাম কামেটের

দিকে। কিন্তু বিধি বাম। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্ত আমরা এক প্রবল নৈরাশ্যের মধ্যে দিনযাপন করছি। কবে যে এই দুর্যোগ কাটবে কে জানে।

শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম। হঠাৎ শেরিং লাকপার ডাকে সম্বিত ফিরে পাই—গুড মর্নিং সাব···

—গুড মর্নিং লাকপা।

—টি সাব···

শেরিং লাকপা হাত বাড়িয়ে চা দেয়। আমি মগ হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করি—আজ আবহাওয়া কেমন লাকপা?

—ভাল। খুব ভাল।

—আমি বিস্মিত। কিছুক্ষণ আগেও তো তুষার পড়ছিল। এরই মধ্যে কি করে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। শেরিং লাকপা বোধহয় আমার সঙ্গে রসিকতা করছে। আমি তাকে বলি—ঠিক বলছ, না-কি···

—ঠিকই বলছি সাব। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে।

আর এক মুহূর্তও তাঁবুর মধ্যে বসে থাকতে পারছি না। তাড়াতাড়ি কোনমতে 'ক্যাম্পস্থ' পায়ে লাগিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

সত্যিই তাজ্জব ব্যাপার। রহস্যময়ী মানা তার অবগুণ্ঠন সরিয়ে নিয়েছে। সে সূর্যালোকে হাসছে। আশপাশের গগনচুম্বী শ্বেতশুভ্র শিখরগুলির মাথায় মুঠো মুঠো সোনা। হিমালয় যেন নব সাজে নব রাগে উদ্ভাসিত। এ দৃশ্য আমি বহু দিন দেখি নি।

হঠাৎ কেন জানি মনে হল, এরকম সুন্দর ঝকঝকে দিন আমরা ভবিষ্যতে আর না-ও পেতে পারি। তা হলে যে আমাদের এখান থেকেই ফিরে যেতে হবে। সুতরাং আজ একবার শিখর আরোহণের চেষ্টা করলে কেমন হয়?

কিন্তু নেতা কি রাজি হবেন? তিনি কি অনুমতি দেবেন শিখরে

যাবার? নিরবিচ্ছিন্ন তুষারপাতের পরে চারিদিক নরম তুষারে ঢেকে গেছে। এর মধ্যে নূতন করে পথের হদিশ করে শীর্ষারোহণ করা অত্যন্ত শ্রমসাপেক্ষ। তা ছাড়া রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নরম তুষার গলবে। স্বাভাবিকভাবেই চলার গতি ব্যাহতহবে। সর্বোপরি তুষারপাতের পরে ধস্ নামার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এসব কথা চিন্তা করে বিশ্বদেবদা যদি শিখর আরোহণের প্রস্তাব অনুমোদন না করেন?

তবু কেন জানি আমার জেদ চেপে যায়। যেমন করে হোক তাঁকে রাজি করাতেই হবে। উত্তেজনায় আমার সারা শরীর কাঁপতে থাকে, এ সুযোগ আমাদের কিছুতেই হারানো চলবে না।

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে দুরু দুরু কম্পমান বক্ষে আমি তাঁবুতে এসে ঢুকি। তারপর কোন দ্বিধা না রেখে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে নেতাকে আমি সরাসরি শিখর আরোহণের প্রস্তাব দিই। বলি —আজ একবার শেষ চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়।

বিশ্বদেবদা রুকস্যাকে ঠেস দিয়ে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ছিলেন। আমার কথা শুনে উঠে বসেন। তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত দেখাচ্ছে।

চারিদিকে অস্বস্তিকর নীরবতা। হাতঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ পর্যন্ত স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস তাঁবুর ওপর আছড়ে পড়ছে। আমি চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে বিশ্বদেবদার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। কঠিন চরম মুহূর্ত।

—আমার কোন আপত্তি নেই। ধীর, স্থির, শান্ত ও সংযত কণ্ঠে বলেন বিশ্বদেবদা—তবে, কোনমতেই ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না।

—সে তো নিশ্চয়ই। আমি আনন্দে আর কোন কথা বলতে পারি না।

মুহূর্তের মধ্যে এত বড় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এ ভাবতেই পারি না।

বিশ্বদেবদা বলেন—নূতন করে রাস্তা খুলে 'সামিট' করা খুব শক্ত হবে প্রাণেশ। একদিনে অতখানি রাস্তা কভার করা···

—জানি বিশ্বদেবদা···তবু একবার চেষ্টা করতে দোষ কি।···

—দেখো। বিশ্বদেবদা অস্ফুটস্বরে বলেন।

—কে কে যাবে আমার সঙ্গে?

—পাসাং ফুতার, শেরিং লাকপা আর পাসাং শেরিং।

সকাল ৮-৩৫ মিঃ। অবশেষে এল সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত শুভক্ষণ। যাত্রা হল শুরু। আমরা আমাদের কামনা-বাসনার সুখ-দুঃখের স্বপ্ন-শিখরের দিকে এগিয়ে চললাম। পাসাং ফুতার আর আমি একটি দড়িতে। অপরটিতে শেরিং লাকপা ও পাসাং শেরিং।

ইতিপূর্বে যে রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল, তা তুষারপাতে সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেছে। তাই বিশ্বদেবদা আগেই নিমা থনডুপ, সোনা, ফু তেনজিং ও আঙরিতাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওরা চারজন রাস্তা খুলতে খুলতে 'কল' পর্যন্ত যাবে। শুরুতেই রাস্তা খোলার কাজে যাতে আমরা পরিশ্রান্ত না হয়ে পড়ি।

অত্যন্ত কাঁচা বরফ। বারে বারেই পা ঢুকে যাচ্ছে। তুষার গাঁইতি যাচ্ছে তলিয়ে। বেশ হুঁশিয়ার হয়ে পথ চলতে হচ্ছে। আশে-পাশের চোরা ফাটলগুলো আজ খুব বেশি নজরে পড়ছে না। পাতলা বরফের আস্তরণে সম্ভবত ঢাকা পড়ে গেছে। তবু সাবধানের মার নেই। তুষার গাঁইতি দিয়ে ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করে পা ফেলছি। পাসাং ফুতার বিপজ্জনক স্থানগুলোতে বিলে করছে, কারণ ভুলক্রমে পা যদি সামান্য এদিক-ওদিক পড়ে তা হলে আর রক্ষে নেই। পতন অবশ্যম্ভাবী।

উত্তর-গাত্রের খাড়াই পথে রাশি রাশি নরম তুষার জমে রয়েছে। আমরা তারই মধ্য দিয়ে বুটের ডগা দিয়ে 'কিক' করে করে এগিয়ে

যাবার চেষ্টা করি। কিন্তু পারি না। পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তাল তাল তুষার পায়ের নিচ থেকে সরে যাচ্ছে। আর উপর থেকে সর্ সর্ শব্দে স্তূপীকৃত আলগা তুষার সেই জায়গা দখল করছে। ফলে আমরা ভারসাম্য রাখতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছি।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম বরফের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা নরম তুষারকণা জুতো এবং পোশাকের ভেতরে ঢুকে এক অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করল। অকস্মাৎ হিমশীতল জলে পড়ে যাওয়ার মত আমরা প্রাণভয়ে সেই তুষার-সমুদ্রে সাঁতরাতে থাকি।

বেশ খানিকক্ষণ পরে পায়ের ওপর ভর দিয়ে যখন দাঁড়ালাম, তখন দেখলাম আমরা একই জায়গায় রয়েছি। এক পা-ও সামনে এগোতে পারি নি। অথচ ত্রিশ-বত্রিশ ফুট ওপরে উঠতে পারলেই ফিকসড রোপ পেয়ে যেতাম। দড়ি ধরে অপেক্ষাকৃত সহজভাবে আরোহণ করতে পারতাম।

ঠিক করা হল, আগে আমাদের মধ্যে দু'জন কষ্টেসৃষ্টে উপরে উঠে যাক। তারা সেখানে পৌঁছে ফিকসড রোপের সঙ্গে আর খানিকটা দড়ি জুড়ে নিচে ঝুলিয়ে দেবে। তারপর আমরা সেই দড়ি ধরে উঠে যাব। তা হলেই আর এই তুষারকাদা ভাঙ্গার হাঙ্গামা পোহাতে হবে না।

নিমা থনডুপ আর শেরিং লাকপা বহু কসরৎ করে উপরে উঠে দেখল ফিকসড রোপ নেই। তারা রাশি রাশি আলগা নরম তুষার সরিয়ে দড়িটাকে খুঁজে বের করার জন্য গোটা অঞ্চল তোলপাড় করে ফেলল। কিন্তু কিছুতেই দড়ি বের করতে পারল না।

আমরা হতাশ হয়ে পড়লাম। নূতন করে আবার যদি দড়ি লাগাতে হয়, তা হলেই হয়েছে।

হঠাৎ নিমা থনডুপ চিৎকার করে উঠল—পাওয়া গেছে।···পাওয়া গেছে।

অবশেষে সেই দড়ির সাহায্যে আমরা যখন মানার কাঁধে উঠে

এলাম তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। প্রবল ঠাণ্ডায় আমার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে এসেছে। ধুপপুক করে প্রচণ্ড বেগে হৃৎপিণ্ডটা কাঁপছে। শ্বাস নিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। মনে হল, আমি বোধহয় আর যেতে পারব না।

নিমা থনডুপ, সোনা, ফু তেনজিং এবং আঙরিতা ফিরে গেল। যাবার সময় নিমা থনডুপ হাসতে হাসতে বলল—জরুর 'টপ্' চলনা চাহিয়ে।

কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে ওঠে। কি কঠিন পরিশ্রম করে ওরা আমাদের পথ তৈরি করে দিয়ে গেল। শিখরের এত কাছাকাছি এসেও ওরা আজ ফিরে যাচ্ছে! একবারও তার জন্য কেউ আক্ষেপ করল না।

বেশ খাড়াই খানিকটা পাথুরে অংশ। অনবরত বাতাসের ধাক্কা লাগে বলে এখানে বোধহয় তুষার জমতে পারে না। তার পরেই রয়েছে কঠিন বরফে আবৃত অংশ। রৌদ্রকিরণের জন্য সেখান থেকে নীলাভ দ্যুতি ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে।

শৈলারোহণ পর্বটা বেশ আস্থার সঙ্গে সারলাম। দড়ি লাগানোই ছিল। তার ওপরে পাসাং ফুতার বেশ শক্ত 'বিলে' দিল। ফলে এই পথটুকু পার হতে বিশেষ বেগ পেলাম না।

এবারে শুরু হল কঠিন আরোহণের পালা। নাক বরাবর উঠে গেছে মসৃণ দেওয়াল। তুষার গাঁইতির সাহায্যে ধাপ তৈরি করে সেই সমস্ত ধাপে পা রেখে রেখে অতি সন্তর্পণে উঠতে থাকি। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে 'বিলে' করি, যাতে কেউ পড়ে না যায়, উঠতে পারে আস্থার সঙ্গে।

কঠিন বরফের ওপর ক্র্যাম্পনের আঘাত লেগে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে। পাসাং ফুতার উঠছে। মাঝে মাঝেই সে তুষার গাঁইতি দিয়ে ধাপ কাটছে। তার ঠুং ঠুং শব্দ ভেসে আসছে। বেশ মিষ্টি লাগছে শুনতে। আমি একটু একটু করে ঘুড়ির লাটাই থেকে সুতো ছাড়ার মত দড়ি ছেড়ে চলি।

হঠাৎ একটা ক্যাশ করে আওয়াজ হল। আমি থমকে দাঁড়িয়ে যাই। সর্বনাশ, এটা পদস্খলনের আওয়াজ। ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে আসে। হৃৎপিণ্ডটা দ্বিগুন বেগে ধক্ ধক্ করে ওঠে। আমি কালবিলম্ব না করে মাথা নিচু করলাম। তারপর সর্বশক্তি দিয়ে তুষার গাঁইতিটাকে বরফের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে ধরে রাখলাম। নির্ঘাৎ পতন থেকে যেমন করেই হোক্ পাসাং ফুতারকে রক্ষা করতে হবে। আমি কোমরে দড়ির টান অনুভব করার জন্য রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করি।

কয়েকটি মুহূর্ত কেটে যায়। লক্ষ্য করলাম, আমরা যে যেখানে ছিলাম, সে সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি। তা সত্ত্বেও অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে আমি উপরের দিকে তাকালাম। না, কিছু দেখছি না তো। সব ঠিক আছে। তা হলে ওটা কিসের শব্দ? নিচ থেকে ওদের কেউ আবার পড়ে যায় নি তো!

প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিচের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালাম। দেখি, পাসাং শেরিং আর শেরিং লাকপা আমার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে। শরীর গরম রাখার জন্য তারা মাঝে মাঝে বরফে পা ঘষছে। আর তাতেই ঐ বিশ্রী শব্দটা হচ্ছে।

কোমরের দড়িতে হঠাৎ টান পড়ে। ভেসে আসে পাসাং ফুতারের কণ্ঠস্বর—আইয়ে প্রাণেশ সাব।

আমি আবার আরোহণ শুরু করি। আমার পেছনে পেছনে পাসাং শেরিং আর শেরিং লাকপাও উঠে আসছে। পাসাং ফুতার উপর থেকে 'বিলে' করে আমাকে।

ঘণ্টাখানেক সময় কেটে গেল। আমরা উঠছি তো উঠছিই। পথের যেন আর শেষ নেই। আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। পা দুটো আর আমাকে বইছে না। আঙুলগুলো নিঃসাড় হয়ে গেছে। নাকের ডগা অসম্ভব জ্বালা করছে। কপালের দু'পাশে রগ টন্ টন্ করছে। আমি বোধহয় এখনই মুখ থুবড়ে এখানে পড়ে যাব।

এখান থেকে মানার চূড়া আর কত দূরে? উপরের দিকে তাকালাম। কিন্তু দৃষ্টি ব্যাহত হল। আড়াআড়ি প্রকাণ্ড উঁচু মোটা একটা ভাঁজ রয়েছে, তার জন্য উপরের কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না।

ঘাড় ফিরিয়ে কামেটের দিকে তাকানোর চেষ্টা করলাম। সামনে কোন বাধা নেই। সুতরাং কামেটকে দেখে অন্ততঃ কিছুটা আঁচ করা যাবে আমরা কতদূর উঠেছি!

কিন্তু কামেটের দিকে তাকাতেই আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে এল। কামেট মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। উত্তুরে বাতাসের তাড়া খেয়ে সারা আকাশ জুড়ে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের আনাগোনা শুরু হয়েছে। কালো কুৎসিত এই মেঘগুলো আর একটু পরেই এক জায়গায় হবে। তারপর শুরু হবে তুষারপাত।

আমার ধারণা অমূলক নয়। শুরুতে ঝড়ো বাতাসের যে দাপট ছিল তা সহসা বন্ধ হয়ে গেল। আর তারপরেই মেঘ চিরে চিরে পড়তে লাগল তুষারকণা।

এই অভাবনীয় তুষারপাতের জন্য আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। কাজেই দিশেহারা হয়ে পড়ি। চারিদিক ঘষা কাঁচের মত ঝাঁপসা—এক হাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না। আমরা উঠব কি নেমে যাব স্থির করতে পারলাম না। একটা প্রবল অনিশ্চয়তার মধ্যে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

পাসাং ফুতার বেশ খানিকটা উপরে, যেখানে ফিকসড রোপ শেষ হয়েছে। সে চিৎকার করে বলল—তোমরা উঠে এসো। এখানে দাঁড়াবার জায়গা আছে।

অন্ধের মত হাতড়াতে হাতড়াতে অতি কষ্টে উঠে এলাম। শেরিং আর লাকপাও উঠে এল। তারপর চারজন জড়াজড়ি করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত তুষারে শাদা হয়ে গেল। এমন কি নাকের ডগায়, দাড়ির ফাঁকে পর্যন্ত তুষারকণা জমে উঠেছে।

তাপমাত্রা নিশ্চয়ই হু হু করে নামছে। আমরা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি। মনে হচ্ছে হাড়ের উপর কেউ করাত চালাচ্ছে।

নানা অজানা আশঙ্কায় মন ভরে ওঠে। কিন্তু প্রকৃতির কেন এই রুদ্ররোষ? মনে পড়ে, পাঁচ বছর আগেও ছলনাময়ী মানা ঠিক এমনিভাবেই পরম সমাদরে অভিযাত্রীদের কাছে টেনে নিয়ে অকস্মাৎ নির্মম কৌতুকে দূরে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। এবারেও কি তারই পুনরাবৃত্তি হবে? অ-ধরা মানা কি কিছুতেই ধরা দেবে না? হতাশার কালকূট পান করে এবারেও কি আমাদের ফিরে যেতে হবে? হিমালয়-নন্দিনী মানার যে দুর্জয় শিখর-চূড়ায় ইতিপূর্বে মানুষ একবার মাত্র পৌঁছতে পেরেছিল, সেখানে কি মানময়ী মানা দ্বিতীয়বার আর কাউকে যেতে দিতে নারাজ? এবারেও কি দূর থেকে শুধু মানার ভয়ঙ্কর সুন্দররূপ দেখেই ফিরে যাব আমরা?

কিন্তু এভাবে এই ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকাও কি খুব নিরাপদ? আজ সারাদিন সারারাত ধরে যদি এই তুষারপাত চলে তা হলে আমরা কি করব? এখানে দাঁড়িয়ে থাকব কী?

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমরা তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি। উপরে বা নিচে, যেখানেই আমরা যাবার চেষ্টা করি না কেন, মৃত্যুকে এড়ানো বড়ই কঠিন। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেও সেই একই পরিণতি হবে।

সুতরাং মৃত্যু যখন অবধারিত, তখন ভেবে আর কোন লাভ নেই। তা ছাড়া পাহাড়ে মৃত্যু খুবই স্বাভাবিক—একথা জেনেশুনেই তো আমরা পাহাড়ে এসেছি! এখন যেটা ভাবতে হবে তা হল এখানে এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে মৃত্যুর জন্য আমরা অপেক্ষা করব, না, যতটা সম্ভব এগিয়ে যাব?

সামনে এগিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তাতে যদি মৃত্যু হয়, হবে।

কিন্তু শেরপারা কি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই দুর্যোগের মধ্যে

এগিয়ে যেতে রাজি হবে? ওরা তিনজন বিবাহিত, স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে নিয়ে ওদের সুখের সংসার আছে। আছে ওদের স্বপ্নময় ভবিষ্যৎ। পাসাং শেরিং তো মাত্র ক'মাস আগে বিয়ে করেছে, ক'দিন আগেও ওর চিঠি এসেছে দার্জিলিং থেকে। আমি নিজে সেই চিঠি পড়ে শুনিয়েছি। জবানী লিখে দিয়েছি। ওরা পরস্পর পরস্পরকে ভীষণ ভালবাসে।

—প্রাণেশ সাব, কি করবে? পাসাং ফুতার হঠাৎ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে।

—তোমরা যা ভাল মনে কর তাই হবে।

—এ অবস্থায় কি তুমি ওপরে যেতে চাও?

—আমার কোন মতামত নেই পাসাং ফুতার।

এর পরেই সে নিজেদের ভাষায় শেরিং লাকপা আর পাসাং শেরিং-এর সঙ্গে কি যেন আলোচনা করল। তারপর বলল—এতখানি পথ এসে আমাদের কারোরই ফিরে যেতে মন চাইছে না। তোমার কি ইচ্ছে? বলেই পাসাং ফুতার এক টানে চোখের গগলসটা খুলে ফেলে আমার দিকে তাকাল। আমি দেখলাম তার গভীর আত্মপ্রত্যয়ে ভরা দু'খানি চোখ। হেসে বলি—আমারও তাই ইচ্ছে।

॥ বারো ॥

আবার শুরু হল পথ চলা। একই মন্ত্রে দীক্ষিত আমরা এক মন এক প্রাণ চারটি মানুষ নতুন উদ্যমে এগিয়ে যাই সামনে। পাসাং ফুতার যথারীতি আগে আগে চলেছে। তার অসীম ধৈর্য, গভীর নিষ্ঠা, দুর্জয় সাহস ও অনমনীয় দৃঢ়তা দেখে আমি বিস্মিত।

সূচীভেদ্য তুষারপাত সমানে চলেছে। আশেপাশের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তারই ভেতর দিয়ে সে ঠিক এগিয়ে চলেছে। বিপজ্জনক জায়গায় আগে থাকতে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে আমাদের।

প্রচণ্ড পিপাসা পেয়েছে। জিভটা বারে বারেই গলার মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছে। নিঃশ্বাস নিতেও ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আমি বোধহয় শেষরক্ষা করতে পারব না।

পাসাং শেরিংকে ডেকে ওয়াটার বটলটা দিতে বললাম। একটু জল না খেতে পারলে আমি আর এক পা-ও চলতে পারব না।

শুনে সে নিঃশব্দে হাসল কেবল। আমার কথার কোন গুরুত্বই দিল না। ভীষণ রাগ হল আমার। তৃষ্ণার্তকে যে জল দিতে কার্পণ্য করে, তার মত পাষণ্ড খুব কমই আছে।

—কি হল পাসাং? আমি অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বলি।

—ওয়াটার বটল তো নিচে ছেড়ে এসেছি।

—সে কি?

—বড্ড ভারি যে! শুধু শুধু বয়ে লাভ কি? হাসতে হাসতে বলে পাসাং শেরিং।

—তার মানে? ভারি বলে ওয়াটার বটল ছেড়ে দিয়ে এলে? আমাকে বললে না কেন? আমি বইতে পারতাম।

—প্রাণেশ সাব, তুমি মিছিমিছি রেগে যাচ্ছ। ওতে জল থাকলে তো! জল যে জমে বরফ হয়ে গেছে।

তাই তো! আমি শুধু শুধু ওর ওপর রেগে গিয়েছি! কিন্তু এখন উপায়? তৃষ্ণায় যে আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! চারিদিকে রাশি রাশি শ্বেতশুভ্র বরফ। কিন্তু তৃষ্ণা নিবারণের জন্য এক ফোঁটা জল নেই কোথাও!

এক ঘণ্টা হয়ে গেল আমরা সমানে উঠে চলেছি। উত্তুঙ্গ খাড়া চড়াই। আমরা যথাসম্ভব এঁকে বেঁকে উঠছি। তাতে বেশি পথ চলতে হচ্ছে, তবে অপেক্ষাকৃত কম কষ্ট লাগছে। ঘন কুয়াশার মধ্যে একবার চূড়াটাকে খুঁজলাম, কিন্তু দেখতে পেলাম না।

বোধহয় পথের বাইরে কোথাও আল্‌গা বরফে পা দিতেই, মুখ গুঁজে পড়ে যাচ্ছিলাম। টেনে হিঁচড়ে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরলাম।

ধরল পাসাং ফুতারও। বিলের দড়িটা শক্ত হাতে ধরে সে আমাকে অনিবার্য পতন থেকে রক্ষা করল।

দেহের পোশাকগুলো নিয়ে হয়েছে এক যন্ত্রণা। আণ্ডারঅয়্যার, উলেন ড্রয়ার, ক্লাইম্বিং ট্রাউজার, উইণ্ড প্রুফ ট্রাউজার ছাড়াও পায়ে দুই প্রস্থ মোজা, অতিকায় বিশাল ক্লাইম্বিং বুট, ক্র্যাম্পন এবং তার নিচে একদলা আটকে থাকা বরফ আমার সারা শরীরে এক অসহনীয় বোঝায় পরিণত হয়েছে। এর পরেও আছে মাথায় বালাক্লাভা, চোখে চশমা, গায়ে গেঞ্জি, উলেন ভেস্ট জামা, পুরু সোয়েটার, উইণ্ড প্রুফ জ্যাকেট, ফেদার কোট। হাতে দু'জোড়া দস্তানা। এগুলোর ভারও কম নয়। বরফে ভিজে ভিজে ওজন দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে অসুবিধা করছে ক্যামেরাটা। উইণ্ড প্রুফ জ্যাকেটের বুক পকেটে ওটা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত ঢল ঢল করছে। মনে হচ্ছে একটা একটা করে এগুলোসব ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারলে খানিকটা ভার লাঘব হত। কিন্তু উপায় নেই। ভারবাহী হয়েই আমাকে এগিয়ে যেতে হবে ওদের সঙ্গে।

হাঁটুতে প্রবল যন্ত্রণা হচ্ছে, ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ঝিন্ ঝিন্ করছে। পায়ের তলায়, হাঁটুতে, পেটে, দেহের কোষে কোষে সুতীব্র যন্ত্রণা। গালে, নাকে, কপালে, দেহের অনাবৃত অংশে বরফের শীতল স্পর্শে সির সির করছে। এখন যদি আমার শ্রান্তক্লান্ত দেহটা চিরদিনের মত এখানে লুটিয়ে পড়ে, তা হলেও বিস্ময়ের কিছু নেই।

হঠাৎ শুরু হল তীব্র বাতাস। কুচি কুচি বরফ উড়ে এসে চোখেমুখে আছড়ে পড়ল। মনে হল রাশি রাশি হিম শীতল সূচ বিঁধছে—চোখে, মুখে, কানে, নাকে, ঠোঁটের ডগায়, দেহের প্রতিটি অনাবৃত অংশে। উপায়ান্তর না দেখে আমরা আত্মরক্ষার জন্য ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে পড়ি। অসহ্য অসহনীয় এই আক্রমণ।

বাতাস যখন থামল, তাকিয়ে দেখি মেঘ কেটে গেছে। আকাশ প্রায় পরিষ্কার। মেঘগুলো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছুটে বেড়াচ্ছে।

আমি ডাইনে, বাঁয়ে, উপরে ও নিচে দেখি। কিন্তু সোজা উপরের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম ছলনাময়ী রহস্যময়ী মানাকে। একেবারে আমাদের হাতের কাছে। আমি আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠি।

ছুরির ফলার মত অপ্রশস্ত শিরা। কাঁচের মত স্বচ্ছ কঠিন তার বরফ। তুষার গাঁইতি দিয়ে ধাপ কেটে, কখনও বা বুটের ডগা দিয়ে আঘাত করে করে আমরা এগিয়ে যাই। এক একটি পদক্ষেপ নিতে দু'মিনিট, তিন মিনিট কি তারও বেশি লাগছে। মাথার ওপর দিয়ে খণ্ড খণ্ড মেঘ দ্রুত আনাগোনা করছে। মানার শ্বেতশুভ্র গায়ে তার ছায়া পড়ছে, আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বিচিত্র সুন্দর এই আলো-আঁধারের খেলা, অনেকটা সিনেমার দৃশ্যপট পরিবর্তনের মত।

পথ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর হয়ে আসছে। দু'পাশে অতল গহ্বর। উত্তর গাত্রের নিচে, বহুনিচে দেখা যাচ্ছে পূর্বি কামেট হিমবাহ। সরু শাদা একখণ্ড সুতোর মত। দক্ষিণ দিকে বাঙ্কে (Bankund gal) হিমবাহ। প্রায় চারহাজার ফুটের ঢল নেমেছে। এখানে বেশ ঘন কুয়াশা জমে আছে। আরো দূরে, বহু দূরে ধূসর বর্ণের একটি উপত্যকা। ফ্রাঙ্ক স্মাইথ ওই পথ ধরেই এসেছিলেন। দক্ষিণ গাত্র দিয়ে তিনি আরোহণ করেছিলেন মানা শিখরে।

এখানকার বরফ কঠিনতর। সহজে ক্র্যাম্পন ধরতে চায় না। বার কয়েক ধাপ কাটতে গিয়ে হাত ফসকে তুষার গাঁইতি ছিটকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম হল।

অবশেষে ধুঁকতে ধুঁকতে টলতে টলতে অর্ধমৃত অবস্থায় আমরা চারটি মানুষ মানার শীর্ষদেশে এসে পৌঁছলাম। আমার ঘড়িতে এখন পাঁচটা বেজে তিন মিনিট। পাসাং ফুতারের ঘড়িতে পাঁচটা পাঁচ আর শেরিং লাকপার ঘড়িতে পাঁচটা বেজে এগার মিনিট। প্রকৃত সময় যা-ই হোক না কেন, এখানে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে

আমাদের দেহের সমস্ত শ্রান্তি ও ক্লান্তি নিমেষে দূর হয়ে গেছে। এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে উঠেছে মন।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি, আর আমাদের ওপরে উঠতে হবে না। স্বপ্নের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে গিয়েছি আমরা। উত্তেজনায় আমার সারা দেহ কাঁপছে। দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম আর উৎকণ্ঠার অবসান হল। আমাদের স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। সার্থক হয়েছে সতীর্থদের ছুঃসহ ক্লেশভোগ। শৃঙ্গ আরোহণের গুরু দায়িত্ব পালন করতে পেরে আমরা গর্বিত। আমরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আলিঙ্গন করি। এমন সুখকর স্মৃতি, মধুময় মুহূর্ত আর আসে নি আমার জীবনে।

প্রচণ্ড বেগে হিমশীতল ঝড়ো বাতাস্ বইছে। বরফের কুচি মেশানো এই বাতাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা দায় হল। বারে বারেই দৃষ্টি ঝাপসা করে দিচ্ছে। পঙ্গু করে দিচ্ছে দেহের শক্তি। গর্বোন্নত মানা—মানময়ী মানার এই আস্ফালন ছুঃসহ। বেদনাদায়ক।

ফেদার কোটের হুডটাকে মাথার ওপর টেনে দিই। অস্পষ্ট আলো-আঁধারের মধ্যে পরিষ্কার দেখতে পাই শিখরদেশ, বেশ চওড়া—ত্রিভুজাকৃতি। দশ বারো জন লোক অনায়াসে এখানে দাঁড়াতে পারে। মাঝখানের কয়েক ফুট জায়গা ছাড়া চারিপাশের, বিশেষ করে, উত্তর গাত্রের দিকের বরফ খুব মজবুত নয়। কার্নিশের মত পাতলা বরফের আচ্ছাদন ঝুলছে। পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে পারে। তাই আমরা মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকি।

এখন এখানে প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান। সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। শীর্ষদেশে আমরা আমাদের জাতীয় পতাকা ও পর্বত অভিযাত্রী সংঘের পতাকা উড়িয়ে দিলাম। পাসাং ফুতার দস্তানা খুলে খালি হাতে ক্যামেরার সাটার টিপতে থাকে।

ইত্যবসরে আমরা প্রাথমিক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানগুলো সেরে ফেলি। ব্রজনদা আমাকে একখানা কালীর ফটো দিয়েছিলেন। আর আমার

নিজের রয়েছে হরপার্বতীর ফটো। একটা ছোট্ট পলিথিনের প্যাকেটের মধ্যে ফটো হু'খানা পুরে শীর্ষদেশে ছোট্ট একটি গর্ত খুঁড়ে ফটো হু'খানি সেখানে রেখে দিই। তারপর কাজুবাদাম, কিসমিস, আপেল, চকোলেট দিয়ে করজোড়ে প্রণতি জানাই। প্রণতি জানাই সেই সর্বশক্তিমানকে, যাঁর আশীর্বাদ ভিন্ন এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন করা কিছুতেই সম্ভব হত না।

পাসাং ফুতার, শেরিং লাকপা ও পাসাং শেরিং নেপালী প্রথামত তিনখানি স্কার্ফ দিয়ে সশ্রদ্ধ চিত্তে শিখর দেবীকে প্রণতি জানায়, স্মরণ করে ভগবান তথাগতকে।

মনে পড়ছে বন্ধুদের কথা। নিমাইদা, মদনদা, ধ্রুবদা, দিলীপদা, প্রদ্যোৎদা, তাপসদা, দীপক, সুজন, শিবশঙ্করদা, নারায়ণের কথা। মনে পড়ছে বিশ্বদেবদাকে, নকুল, শেরপা ও কুলীদের। আজকের সাফল্য তাঁদের চরম আত্মত্যাগ ও আন্তরিক নিষ্ঠার ফসল। তাঁদের কাঁধে পা দিয়েই আমরা আজ মানাশীর্ষে আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছি। আমরা তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা কৃতজ্ঞ বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, বহু জানা আর অজানা শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে। তাঁদের আশীর্বাদ, প্রীতি আর শুভেচ্ছা বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে আমাদের প্রেরণা যুগিয়েছে।

দেখতে দেখতে দশমিনিট কেটে যায়। পাসাং ফুতার ফিরে যাবার জন্য তাড়া লাগায়। এখনই যদি রওনা হওয়া না যায়, তা হলে কিছুতেই সন্ধ্যের আগে আমরা শিবিরে ফিরতে পারব না। অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলব। সারারাত মৃত্যু-শীতল দুর্গম শিখর শিরার উপর বসে থাকতে হবে। হয়তো সে কালরাত্রির আর কোনদিনঅবসান হবে না।

কিন্তু এখন রওনা হলেও কি আমরা দিনের আলো থাকতে থাকতে শিবিরে পৌঁছতে পারব? সন্ধ্যে হতে আর বড়জোর ঘণ্টা দু'য়েক বাকি। দু'ঘণ্টা সময়ের মধ্যে এই দুস্তর পথ পাড়ি দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

তবু কেন যেন আমি মোটেই বিচলিত হই না। অভিযান সফল হয়েছে। এখন ধীরে-সুস্থে ফিরলেই চলবে। তাতে যা হবার হবে।

তাই আমি ধপ্ করে বসে পড়ি। শরীরে যে আর কিছু নেই। একটুও দাঁড়াতে পারছি না। খালি পেট। ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। ঠাণ্ডায় আমার পা অবশ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে গোড়ালি থেকে পায়ের পাতা দুটো কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভীষণ অস্বস্তি লাগছে। ভিজে মোজা জোড়া পাল্টে নিতে পারলে ভাল হতো, অসাড় ভাবটা কেটে যেত। আমি জুতো খুলতে উদ্যত হই। কিন্তু পারি না। সামনের অনিন্দ্যসুন্দর দৃশ্য আমাকে আকৃষ্ট করে। আমি ভুলে যাই স্থান, কাল, পাত্রের কথা। ভুলে যাই আপন সত্তা।

অদূরে পূর্ব দিকে অনামীশৃঙ্গ আর দেওবনকে বড় মোহময় দেখাচ্ছে। পাশাপাশি অন্তরঙ্গ দুই সখী। পাতলা কুয়াশার ওড়নায় মুখ ঢেকে কম্পিত বক্ষে বিস্ময় বিস্ফারিত চখে দেখছে আমাদের—মাটির মানুষদের। সহসা কোন সঙ্কেত পেয়ে যেন ওরা সহজ হল, মাথার ওপর থেকে সরিয়ে নিল ওড়নাখানি। তার সঙ্গে সঙ্গে অবগুণ্ঠন খসে পড়ল গলায়। দেখতে পেলাম লাজুক নম্র মুখ দুখানি। যেন সদ্যস্নাতা শীকরসিক্ত দু'টি হিমালয় দুহিতা। আর একটু দূরে দক্ষিণ দিকে মন্দির পর্বত। আবছা আলোয় দাঁড়িয়ে সেও অসীম কৌতূহলী হয়ে লক্ষ্য করছে আমাদের।

একেবারে চোখের সামনে—দৃষ্টি রোধ করে দৃপ্তময় কামেট—পাশে ডান দিকে অন্যতম পার্শ্বচর আবিগামিন। বাঁ দিকে শ্বেতশুভ্র মুকুটপর্বত-হীরের মুকুট মাথায় দিয়ে সম্রাটের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মেঘ নয়, যেন মুক্ত বিহঙ্গ। চপলমতি বালখিল্যদের মত ভাসতে ভাসতে ওরা যাচ্ছে কামেট, আবিগামিন, মুকুট পর্বতের কাছে।

কিন্তু পরক্ষণেই তাড়া খেয়ে লুকিয়ে পড়ছে দিগন্ত বিস্তৃত শ্বেতশুভ্র পাহাড়ের আনাচে-কানাচে। এই ভাবে বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায়। ওরা উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখে। তারপর যথারীতি আবার ছুটে বেরিয়ে

আসে। আড়াল করে দেয় সবকিছু। এ এক অদ্ভুত লুকোচুরি খেলা।

কামেট আর অবিগামিনের মাঝখান দিয়ে সুদূর উত্তরে দৃষ্টি মেলে ধরি। নীলাকাশে মেঘের পরে মেঘের প্রাসাদ। নিচে ধূসর বর্ণের তিব্বত উপত্যকা। অস্পষ্ট। সীমাহীন দিগন্তে আকাশের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। অনুপম সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য ভাষায় ব্যক্ত করি সে সাধ্য আমার নেই। ফ্রাঙ্ক স্মাইথের ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে—

"...On a mountain-top time's sands are grains of pure gold ;... I remember clearly but one detail in all that enormous landscape, the plateau of Tibet. I saw it to the east of the Ibi Gamin, a yellow strand laid beyond the Himalayan snows, shadowed here and there with glowing clouds poised in a profound blue ocean like a fleet of white-sailed frigates. For the rest there were clouds and mountains ; clouds alight above, blue caverned below over the deeper blue of valleys, citadels of impermeable vapour spanning the distant foothills, and mountains innumerable-snow-mountains, rock-mountains, mountains screne and mountains uneasy with fanged, ragged crests, beautiful mountains and terrible mountains, from the ranges of Nepal to the snows of Badrinath and the far blue ridges of Kulu and Lahoul."

চারিদিকে অদ্ভুত নিশ্চিন্ত মহান এক শান্তিময় নীরবতা। এ নীরবতার সঙ্গে কবরখানা কিংবা শহরতলীর কোন গ্রামের নীরবতার সাদৃশ্য নেই। এ সম্পূর্ণ আলাদা, ভিন্ন স্বাদের ভিন্ন ধরনের নীরবতা। একমাত্র জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আত্মোপলব্ধির দ্বারাই এই নীরবতার স্বর্গীয় শান্তি হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব।

দেখতে দেখতে প্রায় বিশ মিনিট কেটে গেল। সীমাহীন

আকাশের বুকে শাশ্বত শান্তিকে বিনষ্ট করে পাসাং ফুতার বলে ওঠে —ফিরে চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে যে।

আমি লজ্জিত হই। সত্যিই, এভাবে অহেতুক দেরি করার কোন মানেই হয় না। ফিরতে যখন হবেই তখন তাড়াতাড়ি ফেরাই ভাল। সামনে দীর্ঘ ও দুর্গম পথ।

মানাকে চুম্বন করে, সর্বশক্তিমানকে স্মরণ করে আমরা নামতে শুরু করি। আজ আর কোন দুঃখ নেই, আমার মন-প্রাণ তৃপ্ত, চোখ সার্থক—'সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এই দেশে।'

আকাশ মেঘমুক্ত। বাতাস স্তব্ধ। পড়ন্ত সূর্য আর একটু পরেই পাহাড়ের আড়ালে চলে যাবে। চিরশান্তির এই হিম রাজ্যে নেমে আসবে আঁধার।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এল। পাসাং শেরিং সর্বাগ্রে চলেছে। তার একহাতে দড়ি অন্য হাতে তুষার গাঁইতি। মুখে জ্বলন্ত টর্চ। তারই আলোতে অতি সন্তর্পণে সে পথ দেখে নামছে। আমরা চারজন এখন একই দড়িতে চলেছি। অনুসরণ করছি পাসাং শেরিংকে। সর্বশেষে চলেছে পাসাং ফুতার। অভিযানের নির্ভীক সৈনিক। প্রখর তার দৃষ্টিশক্তি। পিছন থেকে সে মাঝে মাঝে দড়ি ধরে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে। নির্দেশ দিচ্ছে ডাইনে যাব, না বাঁয়ে যাব। তার হাতেও একখানা টর্চ।

কতক্ষণ হল জানি না। শুধু জানি, আমরা অনন্ত পথ পেরিয়ে অনন্তকাল ধরে চলেছি। এর শেষ নেই। হয়তো কোনদিন শেষও হবে না।

এখন কিন্তু আর আগের মত অক্সিজেনের অভাব বোধ করছি না। হঠাৎ দড়িতে পড়ল টান। ভেসে এল আর্তচীৎকার। কিছু বুঝবার আগেই দেখতে পেলাম একটা জ্বলন্ত টর্চ গড়িয়ে নিচে, বহু নিচে চলে যাচ্ছে। পাসাং শেরিং একটা তুষার-গহ্বরে পড়ে গেছে।

শেরিং লাকপা সজাগ ছিল। অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সে

নিজেকে সামলে নিয়েছে। টেনে ধরেছে হাতের দড়ি। নিশ্চিন্ত পতনের মুখ থেকে অব্যাহতি পেল পাসাং শেরিং। শেরিং লাকপা এগিয়ে গিয়ে তাকে উঠতে সাহায্য করল।

আমরা আবার পথ চলা শুরু করি। অবশিষ্ট টর্চটি হাতে নিয়ে এবারে শেরিং লাকপা আগে চলল। পাসাং শেরিং এল তার জায়গায়। অর্থাৎ সে চলেছে আমার আগে আগে, আমার পেছনে ফুতার।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। অসংখ্য তারা সারা আকাশ জুড়ে। তারই আলোকে উদ্ভাসিত চারিদিক। রজনী গন্ধার মত শাদা দেখাচ্ছে সব। স্বপ্নময় রাজ্যে মোহময় আবেশ।

রাত প্রায় পৌনে দশটা। মানার কাঁধ পেরিয়ে বেসিনের প্রান্ত ভাগে বসে বিশ্রাম নিচ্ছি। সহসা সামনে আলো দেখতে পেলাম। কারা যেন এই দিকেই আসছে। নিশ্চয়ই আমাদের লোক। এখানে যে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই।

দেবদূতের মতই ওরা ধীরে ধীরে কাছে এল—সোনা, নিমা থনডুপ আর শেরপা সর্দার শেরিং লাকপা। সে কয়েকজন শেরপার সঙ্গে আজই চতুর্থ শিবির থেকে এসেছে। চিন্তিত দলনেতা তাকে পঞ্চম শিবিরে রেখে দিয়েছেন। আমাদের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে তিনি তাদের পাঠিয়েছেন চা, কফি, আর বিস্কুট দিয়ে। ওরা আমাদের দেখে জড়িয়ে ধরল। তারপর ধরা-গলায় বলবার চেষ্টা করল অনেক কথা। কিন্তু তার অনেক কিছুই অব্যক্ত থেকে গেল। ওরা আমাদের পরম যত্ন সহকারে পরিবেশন করল গরম পানীয়। খেতে দিল বিস্কুট। আমরা জীবন ফিরে পেলাম। চন্দ্রালোকে সৃষ্টি হল এক আনন্দঘন পরিবেশ।

রাত সওয়া এগারোটার সময় আমরা পঞ্চম শিবিরে ফিরলাম। শেরপারা আনন্দে আত্মহারা। তারা আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরল। শিবিরের সামনে গড়াগড়ি দিতে শুরু করল। বোধ হয়

ভুলে গেল এখানে মাটি নেই। শুধুই বরফ আর বরফে ঢাকা এ প্রান্তর মৃত্যুশীতল।

ওদের উচ্ছ্বাস একটু প্রশমিত হলে তাঁবুর ভেতরে আসি। বিশ্বদেবদা শুয়ে আছেন। তিনি অসুস্থ। বুকের যন্ত্রণাটা বেড়েছে। আমি তাঁর হাতে মানা শিখর বিজয়িনী পতাকাটি তুলে দিলাম। তিনি সানন্দে সেটি গ্রহণ করলেন। তারপর আমাকে বুকে টেনে নিলেন। তাঁর দু'চোখ বেয়ে নেমে এল অশ্রুধারা—আনন্দাশ্রু। আমিও অশ্রু রোধ করতে পারি না। আমরা কান্নায় ভেঙে পড়ি।

বেশ খানিকক্ষণ পরে। আমরা সকলে শিখরারোহণের অভিজ্ঞতার কথা বলতে যাচ্ছিলাম বিশ্বদেবদাকে। তিনি বাধা দিয়ে বললেন—ওসব পরে শুনছি। আগে তোমার পা দেখি। তিনি সোনাকে ইঙ্গিত করলেন জুতো খুলতে।

অনেক মেহনত করে সোনা আমার জুতোর নিচ থেকে ক্র্যাম্পন খুলল। তারপর জুতো খুলে টেনে বার করল নিঃসাড় পা। সকলেই ঝুঁকে পড়ল আমার পায়ের ওপর। সোনা তার কোলের ওপর পা' দুখানি টেনে নিল। তারপর হাত দিয়ে আঙুলগুলো আস্তে আস্তে টানল। আমি কিছুই টের পেলাম না। সে আরো জোরে টানল। কিন্তু না, আমি এবারেও তা বুঝতে পারলাম না।

অস্বস্তিকর নীরবতা। অনেকগুলো টর্চের আলো এক সঙ্গে আমার পায়ের ওপর পড়ল। আমি প্রকম্পিত মোমের আলোয় দেখলাম, অনেক জোড়া কৌতূহলী চোখ। তাদের মুখগুলো ক্রমশই কেমন যেন হয়ে আসছে। আমার পায়ের আঙুলগুলো ফুলে নীলাভ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে রক্ত জমে বরফের মত কঠিন হয়ে গেছে।

তা হলে কি আমি সত্যি-সত্যিই তুষারক্ষতে (frost bite) আক্রান্ত হয়েছি?

নিমা থনডুপ অভয় দেয়। বলে—সাব এমন কিছু নয়। ওরকম আমারও হয়েছিল। নিচে গরমে গেলেই ঠিক হয়ে যাবে।

সোনাও হাসতে হাসতে আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে —আমারও তাই হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। পায়ে কোন সাড় পাচ্ছি না। পাসাং ফুতার গম্ভীর গলায় বলে—প্রাণেশ সাব, তুমি কিছু ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

—চিন্তা কোর না প্রাণেশ। আমরা যতক্ষণ আছি তোমার কোন ভয় নেই। বিশ্বদেবদা আমার হাত চেপে বলেন।

মনে হচ্ছে সকলেই আমাকে মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছে। তুষারক্ষত আমি স্ব-চক্ষে দেখেছি। সুতরাং সে সম্পর্কে আমার স্পষ্ট ধারণা আছে। আঙুলের রং নীলাভ হওয়া মানেই তুষারক্ষতের পূর্বাভাস। তবু আমি মনকে দৃঢ় করবার চেষ্টা করি। কিন্তু গায়ে যে অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে। আমার মাথা ঝিম ঝিম করছে। আমি কেমন করে নিচে নামব। আজ এই প্রথম আমার ঘরের কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে মা-বাবা, দাদা-বৌদি ও ভাই-বোনদের কথা।

বিশ্বদেবদা 'প্রিসকলের' শিশি খুলতে খুলতে বলেন—এই ওষুধটা খাও। কাল দেখবে পা অনেকটা ভাল হয়ে গেছে।

—সে না হয় খাচ্ছি। কিন্তু কাল আমি এখান থেকে যাব কি করে? আমি আর হাঁটতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। তা ছাড়া জুতোও পরতে পারব কিনা সন্দেহ।

—সে-সব তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। সে ভাবনা আমাদের। তুমি এখন খেয়েদেয়ে ঘুমোও তো! বলেই তিনি অকস্মাৎ চিৎকার করে উঠলেন—মা গো! তার পরেই ছ'হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে কাশতে লাগলেন অবিরাম।

আমি ভীত হই। ওঁর বুকের যন্ত্রণাটা বোধ হয় বাড়ছে। ফু তেনজিং খাবার নিয়ে এসেছিল। তাড়াতাড়ি সে থালাটা এক কোণে রেখে দিয়ে বড় সাহেবকে গিয়ে ধরে। তার চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

॥ তেরো ॥

কাল রাতে আমি একেবারেই ঘুমুতে পারি নি। পায়ের ব্যথাটা মাঝে মাঝেই জেগে উঠছে। আঙুলের ডগাগুলো আজও চিন্ চিন্ করছে। মনে হচ্ছে, কে যেন আঙুলে স্থচ ফুটিয়ে দিচ্ছে। অসহ্য যন্ত্রণা। হাঁটা তো দূরের কথা, দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছি না। কেমন করে নিচে নামব ভেবে পাচ্ছি না।

বিশ্বদেবদার শরীটাও বিশেষ ভাল নেই, তিনিও রাতে ঘুমুতে পারেন নি, বুকের যন্ত্রণায় কেবল এপাশ-ওপাশ করেছেন। তবে নিজের জন্য তিনি মোটেই বিচলিত নন। তাঁর মাথায় এখন এক মাত্র চিন্তা—আমাকে কি ভাবে নিচে নামানো হবে।

অদ্ভুত মানুষ এই বিশ্বদেব বিশ্বাস, আমি তাঁকে যতই দেখছি ততই বিস্মিত হচ্ছি। বুকের যন্ত্রণায় তিনি যে কি ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছেন তা ধারণাতীত। আমি বলব, শুধু মাত্র মনের জোরেই তিনি এই ঠাণ্ডায় ভারি বাতাসে চলাফেরা করছেন। তা না হলে এই অবস্থায় এখানে এরকম ভাবে তিনি দিনের পর দিন কিছুতেই বাস করতে পারতেন না। আমাদের মানা আরোহণের পেছনে তাঁর যোগ্য নেতৃত্ব কতখানি কার্যকরী হয়েছে তা বিচার করার সময় এখনও আসে নি। কারণ অভিযানের শেষ হতে এখনও অনেক বাকি। অতএব সে প্রসঙ্গ আলোচনা করা নিরর্থক। তবে একথা নির্বিদ্বিধায় বলব, প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বরফ কামড়ে পড়ে থাকার পরিকল্পনা বিশ্বদেবদার। তিনি যদি এই সিদ্ধান্ত না নিতেন, তা হলে এবারেও মানা আরোহণ সম্ভবপর হত না। নেতা হিসেবে তাঁর এই দূরদর্শিতা নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। বোধ হয় এই সমস্ত কারণেই 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছিল—কালের নয়, অভিজ্ঞতার বিচারে প্রাগৈতিহাসিক নন্দাঘুন্টি অভিযানের অপরিণত

এবং অনেকটা অনভিজ্ঞ সহনেতা বিশ্বদেব আজ আপন কৃতিত্বে একজন পূর্ণাবয়ব দলনেতা। বিশ্বদেবের বিষয়ে সব চাইতে বড় কথা : এঁর দেহের জোরের চাইতে মনের জোর অনেক বেশি।

হন্তদন্ত হয়ে বিশ্বদেবদা তাঁবুতে এসে ঢোকেন—প্রাণেশ, তোমার রুকস্যাকটা একটু এগিয়ে দিতে পারবে?

—কেন?

—ওটা নিচে পাঠিয়ে দেব।

—সে কি! কে নিয়ে যাবে আমার রুকস্যাক? আমি বিস্মিত হই।

—শেরপাদের কেউ নিয়ে যাবে। এই বলে তিনি রুকস্যাক নিয়ে বেরিয়ে যান তাঁবু থেকে।

আমি কিছু বুঝতে না পেরে চুপচাপ বসে থাকি। এমন সময় সোনা এল। তার হাতে এক জোড়া 'ক্যাম্প সু' আর নাইলনের 'ওভার সু।' হাসতে হাসতে সে বলল—সাব, এগুলো পরে নাও। এক্ষুনি আমরা এখান থেকে সকলে নেমে যাব। বলেই সে আমার পায়ে 'ক্যাম্প সু' বাঁধতে বসে গেল।

আমি তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করি—আমি নামব কি করে? আমি তো একদম হাঁটতে পারব না!

—হাঁটার তো দরকার নেই। সোনা মুখ তুলে আমার দিকে তাকায়—নিমা থনডুপ আর পাসাং শেরিং তোমাকে পিঠে করে নামাবে বলেছে।

—সে কি? আমি বিস্মিত হই। এত উঁচু থেকে একজন মানুষকে পিঠে করে নামানো কি সহজ কথা...

—হ্যাঁ, ওরা পারবে। বড় সাহেবকে ওরা আশ্বাস দিয়েছে। সোনা 'ওভারসু'র লেস বাঁধতে বাঁধতে বলে।

খানিকক্ষণ বাদে বিশ্বদেবদা এলেন। কথাটা যাচাই করার জন্য আমি তাঁকে সে কথা বলতেই তিনি বললেন—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই শুনেছ, পাসাং ফুতারও সঙ্গে থাকবে।

—কিন্তু এভাবে···

—কিচ্ছু ভয় নেই তোমার। দেখবে, ওরা ঠিক নিরাপদে তোমাকে নামাবে।

—আমি সে কথা ভাবছি না বিশ্বদেবদা। আমি ভাবছি এত উঁচু থেকে এই বিশ্রী রাস্তা দিয়ে ওরা আমাকে কি করে নামাবে। যা ঘন বাতাস, ওদের প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

—সে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। বিশ্বদেবদা বলেন—সোনা কি তোমাকে 'ক্যাম্পস্' পরিয়ে দিয়ে গেছে?

—হ্যাঁ।

—তা হলে বাইরে চল। ওরা আবার এক্ষুণি যাবে। চিঠিটা দেওয়া হয় নি। আমার জন্য হয়তো অপেক্ষা করছে।

বিশ্বদেবদাকে ধরে গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে কোনমতে বাইরে বেরিয়ে আসি। দেখি শেরিং লাকপা, সোনা, আঙরিতা আর ফু তেনজিং কোমরে দড়ি বেঁধে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। বিশ্বদেবদা তাড়াতাড়ি পকেট থেকে চিঠি বের করে লাকপার হাতে দিয়ে বলেন—সাবধানে যেও।

—জী সাব। বলেই শেরিং লাকপারা যেতে উদ্যত হয়। বিশ্বদেবদা তাদের বাধা দিয়ে বলেন—তোমরা একটা দড়িতে চারজন যাচ্ছ কেন?

—দড়ি নেই যে।

—সে কি। অতগুলো দড়ি ছিল···

—মোট ছ'খানা এখানে ছিল। তার মধ্যে তিনখানা গতকাল ওপরে ফিকসড রোপ করা হয়েছিল। ফেরার পথে সেগুলো আর খুলে আনা সম্ভব হয় নি। শেরিং লাকপা জবাব দেয়।

—কিন্তু রাস্তা যে বড্ড খারাপ। একশো ফুটের দড়িতে চারজন যাওয়া কোন মতেই উচিত নয়। বিশ্বদেবদা বলেন—ফু তেনজিং অথবা আঙরিতার যে কেউ একজন পরে আমাদের সঙ্গে যেতে পারে।

—না সাহেব, তার আর দরকার নেই। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। আমরা ঠিক নেমে যাব। শেরিং লাকপা আশ্বাস দেয় নেতাকে।

—ঠিক আছে। তবে একটু সাবধানে যেও। এই বলে তিনি শেরিং লাকপাকে মনে করিয়ে দেন—চিঠিটা সাহেবকে মনে করে দিও কিন্তু।

—জী সাব।

—চিঠিতে আমি সবই লিখে দিয়েছি। তা হলেও তোমরা মনে করে ছ' সাতজন শেরপা এবং লকুলকে আজই পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। তা না হলে সমস্ত মালপত্র এখানে পড়ে থাকবে।

—জী সাব।

—আর সাহেবকে বলবে, শৃঙ্গ বিজয়ের খবরটা আজই যেন কোন শেরপা বা লকুলকে পাঠিয়ে ধ্রুব সাহেবকে পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত করে।

—জরুর বাতা দুঙ্গা।

—ধ্রুব সাহেবের চিঠিটা তো তোমাকে দিয়েছি, তাই না?

—জী সাব।

—ওটাও মনে করে দিও কিন্তু। ও চিঠিটাও অত্যন্ত জরুরী। দীপককে ওষুধপত্র নিয়ে উঠে আসতে বলেছি।

—জী সাব।

—ঠিক আছে, তা হলে তোমরা এবারে রওনা হয়ে যাও। আর বেশি দেরি করা উচিত হবে না। কারণ তোমরা পৌঁছুলে তবেই নিচে থেকে ওরা রওনা হবে।

—জী হ্যাঁ।

—সাহেবদের বোল, আমরা ধীরেসুস্থে আসছি। চিন্তা যেন না করে।

—আচ্ছা সাব।

ক্যাঁচ···ক্যাঁচ···ক্যাঁচ···ক্যাঁচ···

চারিদিকে অসীম নিস্তব্ধতা। তারই বুক চিরে বরফের উপর দিয়ে পথ চলার একঘেয়ে ক্লান্তিকর শব্দ। আমি নিমা থনডুপের পিঠে চেপে বসেছি। সে আমার পা দুটোকে দু'হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছে। অত্যন্ত সন্তর্পণে দৃঢ় পদক্ষেপে সে আস্তে আস্তে নেমে চলেছে। তার কোমরে একটা লং স্লিং—ক্যারাবিনার দিয়ে আটকানো। সামনে এবং পিছন থেকে তাতে দুটো দড়ি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তার দুই প্রান্তভাগের একটি সামনে পাসাং শেরিং-এর কোমরে আটকানো অপরটি পিছনে পাসাং ফুতারের কোমরে। তারা উভয়ে বিলের সাহায্যে নিমা থনডুপকে নামতে সাহায্য করছে। অবশ্য, নিমা বিনা তুষার গাঁইতিতে কি ভাবে যে নামছে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। অপরিসীম আত্মপ্রত্যয় না থাকলে এবং অতি কুশলী পর্বতারোহী না হলে এ কিছুতেই সম্ভব নয়।

অত্যন্ত ঘন ভারি বাতাস। তার মধ্যে বোঝা না নিয়ে শুধু খালি হাত-পা-এ চলতেই ভীষণ কষ্ট হয়। আর সেখানে কিনা নিমা থনডুপ আমাকে পিঠে বসিয়ে নিয়ে নামছে। মাঝে মাঝেই সে প্রাণপণ শক্তিতে নাক-মুখ দিয়ে বাতাস টানবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কতটুকু বাতাস সে পাচ্ছে আমি জানি না। তবে আমার হাত দুটো তার গলার দু'পাশ দিয়ে বুকের ওপর ঝুলছে। তাতে আমি স্পষ্ট অনুভব করছি নিমা থনডুপের কি ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। ওর হৃৎপিণ্ডটা অসম্ভব জোরে ধক্ ধক্ করছে। এত জোরে এবং দুর্বার গতিতে যে, মনে হচ্ছে এখনই বুঝি তা ফেটে যাবে। স্তব্ধ হয়ে যাবে চিরতরে। আমার বুকের সঙ্গে ওর পিঠের পোশাকের কিয়দংশ যেখানে লেপ্টে রয়েছে সে জায়গাটা ঘামে ভিজে গেছে। বোধ হয় এটা রক্ত জল হয়ে যাওয়ার লক্ষণ।

ভীষণ খারাপ লাগছে। একজন মানুষের পিঠে এ ভাবে বসে আমাকে নিচে নামতে হচ্ছে। মানুষকে কষ্ট দেওয়ারও একটা

সীমা আছে। অথচ কোন উপায়ও নেই। আমি প্রকৃতপক্ষে এখন নিমা থনডুপের হাতে বন্দী। একবার আমি তাকে বলেছিলাম—তোমার এত কষ্ট আমি সহ্য করতে পারছি না। আমাকে তুমি ছেড়ে দাও। আমি হেঁটে বা হামাগুড়ি দিয়ে যেভাবেই হোক, নেমে যাব।

সে হেসে তার উত্তরে বলল কিনা—তুমি চুপটি করে বসে থাক। তুমি কথা বললে আমার কষ্ট আরো বেড়ে যাবে।

এর আগে কয়েকবার সে আমাকে পিঠ থেকে নামিয়ে কিছু-ক্ষণ করে বিশ্রাম নিয়েছে। কিন্তু এখন আর পিঠ থেকে নামতেই দিচ্ছে না। বিশ্রাম নেবার দরকার হলে সে আমাকে পিঠে নিয়ে বিশ্রাম করছে। হয়তো ভেবেছে, নামিয়ে দিলে আমি আর তার পিঠে উঠতে চাইব না।

সত্যি, অদ্ভুত শেরপা এই নিমা থনডুপ। আগাগোড়া আমি তাকে লক্ষ্য করছি। সর্বদা হাসিখুশি প্রবীণ এই মানুষটা প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথাও বলে না। যে কাজই যখন তাকে দেওয়া হয়েছে, সে হাসি মুখেই তা সমাধা করেছে। এভারেস্ট (২৯,০২৮ ফুট) থেকে চৌ-উ-র (২৬, ৭৫০ ফুট) মত দুর্ধর্ষ অসংখ্য পর্বতা-ভিযানের সে নীরব সাথী। দিনের পর দিন অমানুষিক পরিশ্রম করে এক শিবির থেকে আরেক শিবিরে সে মাল পৌঁছে দিয়েছে। এমন কি অনেক সময় দড়ি লাগিয়ে পথ তৈরি করে দিয়েছে শিখরের কাছাকাছি পর্যন্ত। কিন্তু তবু সে শীর্ষ আরোহণের সুযোগ পায় নি। অবশ্য সে জন্য মনে তার একটুও ক্ষোভ নেই। আর নেই বলেই সে এসব নিয়ে কোন দিন মাথাও ঘামায় নি। আর তারই ফলে বোধ হয় দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে তাকে সারা জীবন অতিবাহিত করতে হচ্ছে।

হঠাৎ আবহাওয়া খারাপ হল। দেখতে দেখতে কুয়াশায় ঢেকে গেল চারিদিক। পিছনে তাকালাম। বিশ্বদেবদা আর লাকপাকে

এখন আর দেখা যাচ্ছে না। দেখতে পাচ্ছি না পাসাং শেরিং আর পাসাং ফুতারকেও। নিমা থনডুপ বলল—তোমার ফেদার কোটের হুডটা মাথায় তুলে দাও। বরফ পড়বে মনে হচ্ছে।

হলও তাই। চিড়বিড় শব্দে তুষারপাত শুরু হল। সেই সঙ্গে ক্রুদ্ধ বাতাসের আস্ফালন। পিছন থেকে পাসাং ফুতারের সাবধান-বাণী ভেসে এল—দাঁড়াও থনডুপ। তুষারপাতের মধ্যে এগিয়ে যেও না।

পাসাং ফুতার দড়ি 'কয়েল' করতে করতে এগিয়ে এল। হঠাৎ তুষারপাতের জন্য পাসাং শেরিং আগেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তাকে ডাকতেই সে-ও অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে উঠে এল আমাদের কাছে। আমরা চারটি মানুষ তখন সেই প্রবল তুষারপাতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম ঠিক মনে নেই। হঠাৎ পাসাং ফুতার বলে উঠল—পৌনে একটা বাজে। কি করব থনডুপ? এগিয়ে যাবে না আরো একটু অপেক্ষা করবে?

—এ তুষারপাত তো থামবে বলে মনে হয় না। শুধু শুধু সময় নষ্ট করে কি লাভ। তারচেয়ে চল ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই।

—তাই চল।

তিনটে বাজে। নিচ থেকে শেরপাদের আসার কথা ছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের দেখা নেই। এর পরে ওরা আর কখন আসবে, আর কখনই বা পঞ্চম শিবির থেকে মালপত্র নিয়ে নামবে!

ওরা এত দেরি করছে কেন? না-কি আমাদের মতই তুষারপাতের জন্য রাস্তায় আটকে পড়েছে? কিন্তু এখন তো আর তুষারপাত হচ্ছে না। সামান্য একটু যা কুয়াশা আছে।

নিমা থনডুপ যথারীতি এগিয়ে চলেছে। আমি তার পিঠে বসে

বসে সাত-পাঁচ ভাবছিলাম। হঠাৎ আমার চিন্তায় ছেদ পড়ে। দেখি ডান পাশে বরফের খাঁজে একটা স্টোভ পড়ে রয়েছে। মাঝপথে এখানে এই স্টোভ কোত্থেকে এল? কেউ কি রেখে গেছে, না ফেলে গেল। কিন্তু তা-ই বা হবে কি করে?

আরো একটু যেতেই আমি দেখতে পেলাম বরফের ঢালে লাইন-বন্দী হয়ে পড়ে আছে পিটন, হাতুড়ি, ক্যারাবিনার ইত্যাদি। আমি নিমা থনডুপকে জিজ্ঞাসা করি—এগুলো এখানে পড়ে আছে, কি ব্যাপার বল তো?

সে কোন ইতস্ততঃ না করে নির্বিকারভাবে জবাব দিল—সোনারা রেখে গেছে।

—কেন?

—ওজন কমাবার জন্য।

—কি যা-তা বলছ তুমি?

—আমি ঠিকই বলছি।

—ওজন কমানোর উদ্দেশ্যই যদি হবে, তা হলে এগুলো এভাবে ছড়িয়ে রেখে যাবে কেন?

—তা অবশ্য ঠিক। বলেই নিমা থনডুপ চুপ করে গেল। তারপর সে তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে চলতে লাগল।

কিন্তু কেন জানি এক অজানা আশঙ্কায় আমার বুক কাঁপতে থাকে। ঘটনাটা কি হতে পারে কাউকে ডেকে যে জিজ্ঞেস করব তারও কোন উপায় নেই। বিশ্বদেবদা এবং লাকপা অনেক পেছনে রয়েছে। শেরিং লাকপা ও পাসাং ফুতার সামনে ও পেছন থেকে 'বিলে' করছে। তাদের জিজ্ঞেস করে কোন লাভ নেই।

আরো খানিকটা নেমে আসার পরে হঠাৎ আবার চোখে পড়ল একপাটি ক্র্যাম্পন। আর ঠিক তার পাশেই শ্বেতশুভ্র বরফের উপর তাজা একদলা রক্ত। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল। আমি নিমা থনডুপকে বললাম—দেখ দেখ নিমা, তাজা খুন!

—তাই তো। মাথা তুলে নিমা থনডুপ দেখে।

—আমার মনে হচ্ছে কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে।

—হতে পারে। অস্ফুট স্বরে সে বলল। তারপর আর এক মুহূর্তও সেখানে অপেক্ষা না করে নিমা থনডুপ নিঃশব্দে এগিয়ে চলল।

আরো একটু পরে আমি যা দেখতে পেলাম তাতে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। সারা শরীর থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল। সে এক মর্মান্তিক বীভৎস দৃশ্য।

অদূরে একটা লাশ পড়ে আছে। কেমন নিঃসাড়, নিস্পন্দ। গায়ের হলদে উইণ্ডপ্রুফ জ্যাকেটটা এখনও একেবারে ঢেকে যায় নি। নইলে জানতেই পারা যেত না যে, ওখানে কেউ মরে পড়ে রয়েছে। আমরা তার উপর দিয়েই ক্র্যাম্পন পায়ে দিব্যি হেঁটে চলে যেতাম।

ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ভয়ঙ্করী মানা পরাজয়ের প্রতিশোধ নিল একটি নিরীহ প্রাণকে ছিনিয়ে নিয়ে। কান্নায় আমার বুক ফেটে যাবার উপক্রম হল। আমি চিৎকার করে উঠি—ওখানে কে পড়ে আছে?

আমার চিৎকার শুনতে পেয়ে পিছন থেকে পাসাং ফুতার তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। বলল—কি হয়েছে?

আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। ইশারায় শুধু দেখিয়ে দিলাম সামনে।

পাসাং শেরিং লাশটার কাছেই চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। আমরা নিঃশব্দে ধীরে ধীরে সেদিকে এগিয়ে যাই। একটা তুষারগাঁইতি পড়েছিল লাশটার পাশে। পাসাং শেরিং সেটা তুলে পা দিয়ে লাশটাকে উপুড় করবার চেষ্টা করল। আমি তাড়াতাড়ি মাথা নিচু করে চোখ বন্ধ করে ফেললাম। এ দৃশ্য আমি কিন্তু কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।

—কি হয়েছে পাসাং? পাসাং ফুতার নেপালীতে জিজ্ঞেস করল।

—নিশ্চয় কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। এখানে ওখানে রক্তের ফোঁটা পড়ে আছে।

—ওটা কি ?

—কোনটা ?

—তোমার পায়ের কাছে ?

—এটা তাঁবু। পাসাং শেরিং একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে জবাব দেয়।

শুনে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটল কি করে ? সোনারা তো চারজন একই দড়িতে বাঁধা ছিল। তা হলে কি দড়ি ছিঁড়ে দুর্ঘটনা ঘটল ? কিন্তু তা-ই বা হবে কি করে ?

আমাকে নামিয়ে দিয়ে ওরা তিনজন দেখতে গেল। কিন্তু একটু পরেই ওরা ফিরে এল। কুয়াশার জন্য কিছু দেখা যাচ্ছে না। পাসাং ফুতার বলল—চল, আমরা আগে নেমে যাই তাড়াতাড়ি। পরে এসে খোঁজ করা যাবে।

—সে-ই ভাল। পাসাং শেরিং বলে।

—কিন্তু দেরি হয়ে যাবে না। নিমা থনডুপ ম্লান স্বরে বলে—তখন এসে হয়তো দেখবে প্রাণহীন কয়েকটা দেহ পড়ে আছে শুধু। অসম্ভব গম্ভীর শোনাল তার গলা।

—এখন খুঁজে পেলেও যে জীবিত অবস্থায় পাবে তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়। পাসাং ফুতার ধীরে ধীরে বলে—কতক্ষণ আগে দুর্ঘটনা ঘটেছে কে জানে। এক ঘণ্টা বা তারও বেশি আগে যদি দুর্ঘটনা ঘটে থাকে তা হলে ওরা আর কেউ বেঁচে নেই। সুতরাং…

॥ চৌদ্দ ॥

ওরা সম্ভবত আমাদের দূর থেকে লক্ষ্য করে থাকবে। অধীর আগ্রহে সকলেই অপেক্ষা করছিল। আমরা কাছে আসতেই ঘিরে ধরল তারা। কিন্তু একটি কথাও কেউ উচ্চারণ করল না মুখে।

শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে একবার আমার দিকে আর একবার বাকি তিনজনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। বোধহয় সান্ত্বনা জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না কেউ।

আমি হতবাক। ভীষণ অস্বস্তি বোধ করি। কি বলে কিভাবে শুরু করব ভেবে ঠিক করতে পারি না।

আঙনিমাই প্রথম মুখ খুলল। ছলছল চোখে সে আমাকে বলল—ফু শুধু ওদের তিনজনের কথাই বলেছিল। আপনার কথা একবারও কিন্তু বলে নি।

—ওর কি আর মাথার ঠিক আছে! হঠাৎ গ্যালজেন অস্ফুটস্বরে মন্তব্য করে।

—তা অবশ্য ঠিক…

আমি ওদের এই কথাবার্তা সঠিক উপলব্ধি করতে পারি না। তবে একটা দুর্ঘটনা যে ঘটেছে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমি জিজ্ঞেস করি—ফু কি বলেছে? ফু কোথায় গ্যালজেন?

—শেরিং লাকপা, সোনা, আঙরিতা কোথায়?

পাসাং ফুতার আমার কথার পিঠে প্রশ্ন করে বসে—ওদের দেখতে পাচ্ছি না তো!

—সে কি? তোমরা জান না ওরা এক মারাত্মক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে? আঙনিমা উত্তেজিতভাবে বলে।

—কই, না তো। নিমা থনডুপ আমাকে তার পিঠ থেকে নামাতে নামাতে বিস্ময় প্রকাশ করে।

এমন সময় তাপসদা সুজনকে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলেন। সুজনের হাতে একটা ফার্স্ট এড বক্স। আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে তাপসদা শেরপাদের কড়া হুকুম করেন—সাব কো তাম্বু কা অন্দর লে যাও। বলেই তিনি আমার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসেন। তারপর জড়িয়ে ধরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন—তোর কোথায় চোট লেগেছে রে!

এবারে আমার সমস্ত ব্যাপারটা বোধগম্য হয়। আমি বলি—আমার তেমন কিছুই হয় নি তাপসদা। বোধহয় frostbite হয়েছে।

—ও, তাপসদা একটু অন্যমনস্ক হয়ে যান। মাথা নিচু করে কি যেন ভাবতে থাকেন।

—ফু তেনজিং কোথায়? আমি পাল্টা প্রশ্ন করি, ওরা ফিরেছে?

—হ্যাঁ, ফিরেছে। তবে সর্বনাশ হয়ে গেছে।

—কি হয়েছে?

—আগে তোরা তাঁবুতে চল, পরে সব বলছি।

—বিশ্বদেব কোথায়? পিছন থেকে সুজন প্রশ্ন করে।

—বড়া সাব আর লাকপা পিছনে আসছে। নিমা থনডুপ জবাব দেয়।

—ওরা ভাল আছে তো?

—বিশ্বদেবের বুকের ব্যথাটা কমেছে? তাপসদা ফস্ করে জিজ্ঞেস করেন।

—না।

কথা বলতে বলতে আমরা তাঁবুর কাছে আসি। তাপসদা আর সুজন ধরাধরি করে আমাকে এয়ার-ম্যাটট্রেসের ওপর বসিয়ে দেয়। তারপর আঙনিমাকে চা দিতে বলে তিনি তাঁবুর বাইরে যেতে যেতে আমাকে বলেন—তুই একটু বিশ্রাম নে। আমি ওদের একটু দেখে আসি।

—আচ্ছা।

তাপসদা বেরিয়ে যান। আমি আর সুজন মুখোমুখী বসে থাকি। সুজনকে বড় চিন্তান্বিত দেখাচ্ছে। মাথা নিচু করে সে একটা সিগারেট ধরাল। চারিদিকে কেমন যেন এক অস্বস্তিকর থমথমে ভাব। আমার একটুও ভাল লাগছে না। শেরপাদের কি হয়েছে জানবার জন্য মন উদগ্রীব হয়ে ওঠে। আমি থাকতে না পেরে সুজনকে বলি—ফু তেনজিংদের কি হয়েছে? ওরা কোথায়?

—ওরা চারজনই এখানে আছে। উপর থেকে পড়ে গিয়ে ওরা সাংঘাতিকভাবে জখম হয়েছে। বাঁচবে কিনা সন্দেহ। সুজন খুব ধীরে ধীরে জবাব দেয়।

—সে কি? শুনে আমি আঁতকে উঠি।

সুজন আস্তে আস্তে তুর্ঘটনার করুণ কাহিনী বলে। তখন তুপুর সাড়ে বারোটা হবে। বাইরে বরফের কুচি মেশানো ঝড়ো বাতাসের তাণ্ডব নৃত্য চলেছে। ওরা খেয়ে দেয়ে সকলেই স্লিপিং ব্যাগে আশ্রয় নিয়েছে। এমন সময় হঠাৎ একটা চিৎকার দূর থেকে ভেসে আসে।

চিৎকার শুনে ওরা তাঁবুর ভেতর থেকে বাইরে উঁকি দেয়। কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না। চারিদিক কুয়াশায় আচ্ছন্ন।

কিছুক্ষণ পরে আবার সেই শব্দ ভেসে আসে। ওরা ভাবল মানা আরোহণ করে সকলেই জয়োল্লাস করতে করতে ফিরে আসছে। সেজন্য ওরা তাড়াতাড়ি জুতো পরে বেরিয়ে আসে তাঁবুর বাইরে।

একটু পরে ওরা দেখতে পেল তুষারমাখা একটি ছায়ামূর্তি খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে আসছে। ওরা ছুটে আলিঙ্গন করতে গেল। কিন্তু পারল না। রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত ফু তেনজিংকে দেখে সকলেই আঁতকে উঠল। একি হাল হয়েছে তার, ভাঙাচোরা নড়বড়ে দেহটা নিয়ে সে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। এখনই বুঝি লুটিয়ে পড়বে নিচে।

—কি হয়েছে ফু তেনজিং? ভয়ে ভয়ে তাপসদা জিজ্ঞেস করেন।

—সাব, হাম লোগকো বাঁচাও। সাব, হাম মর গিয়া। বলেই ফু তেনজিং পড়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি ওরা তাকে ধরে ফেলে। তারপর নিয়ে আসে তাঁবুতে। শুইয়ে দেয় এয়ার-ম্যাটট্রেসের উপর। ততক্ষণে সে প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়েছে। বিকারের ঘোরে চিৎকার শুরু করেছে—সাব বাঁচাও। সাব বাঁচাও।

একটু ধাতস্ত হবার পরে ফু তেনজিং আস্তে আস্তে তুর্ঘটনার কথা ব্যক্ত করে। শেরিং লাকপা, সোনা, আঙরিতা আর সে পঞ্চম শিবির

থেকে এখানে নেমে আসছিল। হঠাৎ সামনে থেকে আঙরিতা পা পিছলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বরফের ঢালে। তার ফলে ওদের তিনজনের কোমরের দড়িতেও প্রবল টান পড়ে। পা যায় ফস্‌কে। এই ঘটনায় তারা হকচকিয়ে যায়। চোখের পলকে তারাও সঙ্গে সঙ্গে ভারসাম্য হারিয়ে গড়িয়ে পড়ে মাটিতে।

এর পরের ঘটনা ফু তেনজিং-এর সব ভাল মনে নেই। শুধু মনে আছে তারা মাধ্যাকর্ষণের প্রবল টানে একই দড়িতে বাঁধা চারটি প্রাণী প্রায় এক হাজার ফুট কঠিন মসৃণ খাড়াই বরফের ঢাল দিয়ে ছোট্ট নুড়ির মত ভীমবেগে নিচে গড়াতে থাকে। তুষারগাঁইতিটাকে বরফের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে পতন রোধ করবার জন্য তারা বার কয়েক আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সফল হয় নি। তুষারগাঁইতি হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

এক ঘণ্টা কি তারও বেশি সময় অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিল ফু তেনজিং। যখন তার জ্ঞান ফিরল, সে দেখে, সে একা বরফের উপর পড়ে রয়েছে। সারা শরীরে তার অসহ্য যন্ত্রণা। উঠে দাঁড়াবার মত ক্ষমতা নেই। কিন্তু তবু সে বাঁচার তাগিদে উঠে দাঁড়ায়। আশে-পাশে সঙ্গীদের খুঁজে দেখে। নাম ধরে চিৎকার করে ডাকে। কিন্তু কাউকেই সে দেখতে পায় না। তখন সে বিনা ক্র্যাম্পনে, তুষারগাঁইতি ছাড়াই একাকী কঠিন বরফের ঢাল পেরিয়ে চতুর্থ শিবিরে দুর্ঘটনার খবর দিতে রওনা হয়।

সুজন বলল—ফু তেনজিং-এর মুখ থেকে শোনবার পরেই ছুঙ্গে, আঙনিমা আর গ্যালজেন দুর্ঘটনাস্থল থেকে আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে। তখন ওদের কারুরই জ্ঞান ছিল না।

সুজন একটু থামে। তার পরে আবার বলে চলে—ভগবানের অশেষ করুণা যে, ফু তেনজিং-এর জ্ঞান ফিরেছিল। সে যদি শিবিরে এসে দুর্ঘটনার খবর না দিত তা হলে হয়তো আমরা ওদের চারজনকেই চিরতরে হারাতাম।

তার চেয়েও বড় কথা, সুজন একটু থেমে বলে, ওরা গড়িয়ে পড়ে বরফের ভাঁজে যেখানে আটকে ছিল, ঠিক তার কয়েক ফুট নিচেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কতগুলো খাদ ছিল। যদি ওরা সেই ভাঁজে আটকে না যেত তাহলে নিশ্চয়ই গড়িয়ে পড়ত খাদে।

আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কি সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। ওরা যে কিভাবে বেঁচে গিয়েছে, ভাবতেই পারছি না। হয়তো দৈব ছাড়া আর কিছু নয়।

শেরিং লাকপার আঘাত সবচেয়ে গুরুতর। কঠিন বরফের ঢাল দিয়ে গড়িয়ে পড়ার ফলে ওর মুখখানা একেবারে থেঁতলে গেছে। নাক, চোখ, ঠোঁট বলে কিছু যে ছিল তা আর এখন বোঝাই যাচ্ছে না। সকালের রক্তিম সূর্যের মত মুখখানা একটা গলিত মাংসপিণ্ডের মত দেখাচ্ছে। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে তার। কিন্তু কিছু বলতে পারছে না। কেবল গোঁ গোঁ শব্দে কাতরাচ্ছে।

আঙরিতার অবস্থা অতটা খারাপ না হলেও খুব ভাল নয়। তার যে সঠিক কোন্ জায়গায় আঘাত লেগেছে সে বলতে পারছে না। তবে সারা শরীরেই যন্ত্রণা। কাউকে হাত দিতে দিচ্ছে না। ধরলেই চিৎকার করে উঠছে।

সোনার সম্ভবত পায়ের হাড় ভেঙে গিয়ে থাকবে। কিন্তু ছেলেটির আশ্চর্য সহ্যশক্তি। সে একটুও চিৎকার বা চেঁচামেচি করছে না। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে চুপচাপ পড়ে আছে।

ফু তেনজিং-এর কপাল বোধ হয় ভাল। তার আঘাত ততটা মারাত্মক নয়। সেও চুপচাপ শুয়ে রয়েছে এয়ার-ম্যাটট্রেসের উপর। নড়াচড়া করলে কেবল কাঁধে একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। তবে সেটা অত প্রবল নয়।

বিশ্বদেবদা বললেন—এখান থেকে ওদের তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়ে নিতে হবে। যত শীগগির সম্ভব চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে এই ঠাণ্ডায় প্রাণ-সংশয় হবে।

বিকেল তখন ছ'টা। দুর্ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে পাসাং ফুতারকে তৃতীয় শিবিরে জরুরী বার্তা পাঠালেন নেতা। নিচের যেখানে যত কুলী আর লকুল আছে তাদের সবাইকে তিনি আগামীকাল প্রস্তুত থাকবার জন্য নির্দেশ দিলেন। সেই সঙ্গে নির্দেশ দিলেন দলের চিকিৎসক দীপককে। ওষুধপত্র নিয়ে সে যেন আগামী কাল উপরে উঠে আসে।

পরে শুনেছি সেদিন রাত প্রায় আটটার মধ্যেই পাসাং ফুতার তৃতীয় শিবিরে পৌঁছে গিয়েছিল। সেখানে তখন ছিলেন মদনদা, প্রদ্যোৎদা, কয়েকজন নেপালী কুলী এবং লকুল। পাসাং ফুতারের মুখে দুর্ঘটনার বিবরণ শুনে প্রথমে মদনদারা খুব আশ্চর্য হয়ে যান। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ এবং চিঠি লিখে দু'জন কুলীকে নিচের শিবিরে পাঠিয়ে দেন।

সেদিন দু'নম্বর শিবিরে কেউ ছিল না। শিবির ফাঁকা দেখে কুলীরা একটু সময় নষ্ট না করে তখনই এক নম্বর শিবিরের পথে রওনা হয়ে যায়। তারপর সামান্য টর্চের আলোব উপর নির্ভর করে প্রবল ঠাণ্ডার মধ্যে বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে এক নম্বর শিবিবে পৌঁছায়। রাত তখন এগারোটা।

সেখানে ছিল নারায়ণ। অত রাতে সে দু'জন কুলীকে দেখে ভীষণ ঘাবড়ে যায়। পরে সে মদনদার চিঠি পড়ে সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পারে। তারপর তখন ওখানে যে ক'জন কুলী ছিল তার মধ্য থেকে দু'জনকে বেছে নিয়ে নারায়ণ সেই রাত্রেই পাঠিয়ে দেয় মূল শিবিরে।

ঘুঁটঘুটে অন্ধকার। রাস্তাও খুব ভাল নয়, তার উপরে সে রাতে ঠাণ্ডাটাও বেশ জাঁকিয়ে পড়েছিল। একটি মাত্র টর্চ সম্বল করে বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে কুলী দু'জন যখন বসুধারাতাল-এ পৌঁছল তখন রাত একটা। অনেক কষ্টে তারা অন্ধকারের মধ্যে তাঁবু খুঁজে বের করেছিল।

তখন ওখানে ছিলেন নিমাইদা, ধ্রুবদা, দিলীপদা, শিবশঙ্করদা, আর দীপক। সকলেই গভীর ঘুমে অচেতন। হঠাৎ মাঝরাত্রে কুলীদের ডাকাডাকিতে ওঁরা প্রথমে দিশেহারা হয়ে পড়েন। তারপর একটু সামলে নিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে তাড়াতাড়ি সকলে উঠে বসেন। জিজ্ঞাসা করেন, এত রাতে, কি ব্যাপার?

কুলীরা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তারা হাঁপাতে হাঁপাতে তখন যেটুকু পারল বলল তাঁদের। আর পকেট থেকে বের করে দিল চিঠি।

কয়েকটি মুহূর্ত। একদিকে জয়ের খবর, অন্যদিকে দুর্ঘটনার মর্মন্তুদ খবর! তাঁরা হাসবেন কি কাঁদবেন ভেবে পেলেন না। বজ্রাহতের মত চুপচাপ বসে রইলেন। এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনার কথা তাঁরা কেউ স্বপ্নেও ভাবেন নি। আহতদের শেষ পরিণতির কথা ভেবে তাঁরা ভয়ে শিউরে উঠলেন।

তক্ষুণি ডে-লাইট জ্বালানো হল। কুলীদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তৈরি হতে নির্দেশ দেন শিবশঙ্করদা। ইত্যবসরে দীপক ওষুধপত্র গোছগাছ করে ফেলে। অপারেশনের ছুরি-কাঁচি, অক্সিজেন সিলিণ্ডার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস কিছুই নিতে ভুল করল না সে। দিলীপদারা এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেন। তারপর ভোরের আলো ফুটে উঠতেই কুলীদের নিয়ে দীপক আর দিলীপদা মূল-শিবির থেকে উপরের দিকে রওনা হন।

প্রবল উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্যে রাত কাটিয়ে পরের দিন আমরা তৃতীয় শিবিরের পথে রওনা হলাম। আটজন শেরপা ও নকুল প্রাণপাত পরিশ্রম করে আমাদের পাঁচজনকে পিঠে করে বিপদসঙ্কুল পথ দিয়ে নামিয়ে আনল তৃতীয় শিবিরে। বিশ্বদেবদা কিন্তু হেঁটেই এলেন।

আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা গরম খাবার পেলাম। শেরিং লাকপার পক্ষে শক্ত খাবার খাওয়া সম্ভব নয়, তাই তাকে দেওয়া হল হরলিকস। মদনদা বেছে বেছে জনাসাতেক শক্তসমর্থ নেপালী বাহক ঠিক করে রেখেছিলেন। আমরা খেয়ে-দেয়ে আবার তাদের পিঠে চেপে বসি।

সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ আমরা দ্বিতীয় শিবিরে পৌঁছলাম। এখানে দেখা হল দীপক ও দিলীপদার সঙ্গে। তাঁরাও একটু আগে মূল-শিবির থেকে এখানে উঠে এসেছেন। দিলীপদা ও দীপক খুবই উদ্বিগ্ন। এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে দীপক ওষুধপত্র নিয়ে ছুটে এল। শেরিং লাকপা ও আঙরিতার অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সে তাদের দেখেশুনে এসে বলল—মূল-শিবিরে না নামানো পর্যন্ত আমি কিছু বলতে পারব না।

আরও একটি উদ্বেগপূর্ণ রাত কাটল। আমরা অবশেষে নেমে এলাম মূল শিবিরে। তখন প্রায় সন্ধ্যা। একে তো ভীষণ ঠাণ্ডা, তার ওপর আলোর অভাব। পোষাক-পরিচ্ছদ খুলে দীপক আহতদের পরীক্ষা করার সুযোগ পেল না। কোনমতে ওষুধপত্র ও ইনজেকশন্ দিয়ে রাতের মত প্রাথমিক চিকিৎসা করল।

ভোর হতেই দীপক আবার তার কাজে লেগে গেল। একে একে সে সকলকে পরীক্ষা করল। ফু তেনজিং-এর 'কলার-বোন' ভেঙ্গেছে। সোনার ভেঙ্গেছে গোড়ালির হাড়। ফুলে গিয়ে আঙরিতার পা বীভৎস আকার ধারণ করেছে। কাঁচি দিয়ে প্যাণ্ট কেটে তার পা বের করল দীপক। হাঁটু থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত আগাগোড়া নীল। দীপকের ধারণা, হাড় ভেঙ্গে যাওয়ার ফলেই তার পায়ের এই অবস্থা। এর উপরে যদি ঠাণ্ডায় আবার তুষারক্ষত হয়, তা হলে পা কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না।

শেরিং লাকপার মুখখানাও বেশ ফুলে উঠেছে। তার সারা গা ছড়ে গেছে। সে কথা বলতে পারছে না। সম্ভবত মাথায়ও আঘাত লেগে থাকবে।

দীপক বলে—অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এদের বাঁচাতে হলে এখনই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।

শুনে সকলেই চিন্তিত হয়। কি করে তা সম্ভব? এখান থেকে আহতদের নামানোই তো এক বিরাট সমস্যা। আমাদের সঙ্গে না আছে স্ট্রেচার, না আছে বয়ে নিয়ে যাবার কোনও বিকল্প ব্যবস্থা। তা ছাড়া যোশীমঠের আগে কোন হাসপাতাল নেই। কিন্তু সে-ও তো এখান থেকে প্রায় সত্তর মাইল। আহতদের পিঠে করে নামাতে কমপক্ষে সাতদিন লেগে যাবে। এত দেরি হলে ওদের বোধহয় কাউকেই বাঁচানো যাবে না। একমাত্র সমাধান, যদি একখানা হেলিকপটার পাওয়া যায়।

২৪শে ডিসেম্বর। নিমাইদা, প্রদ্যোৎদা ও পাসাং ফুতার মূল শিবির থেকে তিনদিনের পথ দেড়দিনে পাড়ি দিয়ে গামশালি পৌঁছলেন। সেখানকার পুলিশ-ফাঁড়ি থেকে বেতারে দুর্ঘটনার খবর পাঠালেন দিল্লীতে ইণ্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউণ্ডেশানে।

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফাউণ্ডেশানের চেয়ারম্যান শ্রী এইচ. সি. সারিন এবং সেক্রেটারি শ্রী আর. এম. চক্রবর্তী প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষকে অতি সত্বর একখানি হেলিকপটার পাঠাবার অনুরোধ জানালেন।

এদিকে আহতদের নিয়ে মালারিতে উপস্থিত হবার জন্য দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ থেকে বেতারে বিশেষ নির্দেশ এল। আগামী কালই ভারতীয় বিমান বাহিনীর একখানি হেলিকপটার মালারিতে অবতরণ করবে। তারপর সেখানা আহতদের নিয়ে যাবে বেরিলি। ঠিক হয়েছে সেখানকার সিভিল হাসপাতালে তাদের চিকিৎসা করা হবে।

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দীপক তার রুগীদের নিয়ে রওনা হয় মালারি। দিলীপদা সঙ্গে যান। রাত তিনটায় রওনা হয়ে একটানা হেঁটে তাঁরা প্রথম দিন সেপুক ও পরের দিন মালারিতে পৌঁছান। কিন্তু হা হতোস্মি। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য

হেলিকপটার দু'-দু'বার চেষ্টা করেও অবতরণ করতে পারে নি। কয়েকটা চক্কর মেরে ফিরে যায় যোশীমঠে। পরক্ষণেই বেতারে নির্দেশ আসে, আহতদের নিয়ে যোশীমঠে চলে আসুন।

সেনাবাহিনীর গাড়িতে করে সেই রাতেই দীপক ও নিমাইদা তাদের নিয়ে যোশীমঠ রওনা হলেন।

শেষ পর্যন্ত সমস্ত উদ্বেগের অবসান ঘটিয়ে ২৫শে সেপ্টেম্বর চারজন আহত শেরপাকে হেলিকপটার যোগে বেরিলির হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয়।

আমি ও বিশ্বদেবদা দলের বাকি সদস্যদের সঙ্গে যোশীমঠে এলাম। সেখানকার সামরিক হাসপাতালে আমাদের চিকিৎসা করার বন্দোবস্ত করা হল।

খবরের কাগজ ও রেডিওর মাধ্যমে ইতিমধ্যে দুর্ঘটনার খবরটা চারিদিকে বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বভাবতঃই আমাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব তখন দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন। আমরাও নিশ্চিন্ত নই। আমরা চিন্তিত শেরপাদের জন্য। কে জানে, কেমন আছে শেরপারা।

প্রথমে খবর পেলাম আনন্দবাজারে শ্রী গৌরকিশোর ঘোষের রিপোর্ট পড়ে। তিনি দুর্ঘটনার খবর পেয়েই কলকাতা থেকে দিল্লী উড়ে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীখগেন দে সরকারকে নিয়ে তিনি বেরিলির হাসপাতালে হাজির হন। শেরপাদের দেখে-শুনে তিনি খবর পাঠিয়েছেন—শেরপাদের জীবনাশঙ্কা নেই। হাসপাতালে ডাঃ জি. কে. শ্রীবাস্তব এবং ডাঃ যশোবন্ত সিং আহত শেরপাদের বিশেষ যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করছেন।...ইত্যাদি ইত্যাদি।

সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। যাক্ তাহলে আর ভয়ের কোন কারণ নেই। ধ্রুবদাকে খুব খুশি মনে হল। তিনি বললেন—ছাখ, কথায় কয়, যার শ্যাষ ভাল তার নাকি সব ভাল। তা আমাগোর শ্যাষটা তো ভালই হইছে। কি কস? অহন আর চিন্তা ভাবনার কিছু নাই।

ধ্রুবদা হয়তো ঠিকই বলেছেন। আহতদের নিয়ে পাহাড়ী পথ অতিক্রম করার কালে আমাদের চিন্তার অন্ত ছিল না। সময় মত আমরা যোশীমঠ পৌঁছতে পারব কি? আহত অঙ্গ অটুট রেখে শেরপাদের সুস্থ করা সম্ভব হবে কি? এ ধরনের নানা প্রশ্নে আমরা অত্যন্ত বিচলিত ছিলাম। কিন্তু আপাততঃ সে চিন্তা দূর হয়েছে।

আগের তুলনায় দলের সবাই এখন বেশ তরতাজা। অনেকদিন পরে সকলে বেশ হাসি-ঠাট্টা, আমোদ-আহ্লাদে মেতে উঠেছে। জয়ের আনন্দ ফিরে আসতে শুরু করেছে।

আমি ভাবছি মানসী মানার কথা। চির-সুন্দর ও চির-উন্নত মানা-শৃঙ্গ ভারতের জাগ্রত যৌবনকে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে নিল। এ তো শুধু শুভ্র তুষার কিরীটিনী ও ভয়াল-ভীষণা শৃঙ্গ বিজয় নয়, সমস্ত প্রতিকূলতা ও বিরুদ্ধ শক্তির কাছে অনমনীয়-পৌরুষ, অমিতবীর্য-যৌবন আর তাজাপ্রাণের আশ্চর্য সুন্দর প্রতিষ্ঠা। অসীম ধৈর্য, অধ্যবসায়, উদ্যম ও সদিচ্ছাই অবশেষে মানার রুপোলি শিখরে ভারতের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করল। ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হলেও আনন্দ অবিমিশ্র নয়। বিষ ও অমৃত একই সঙ্গে ওষ্ঠাধরে তুলে ধরেছেন তিনি। কুসুমে কীটের মতই এই দুর্ঘটনা। কিন্তু তা হোক, চরম দুঃখে যেন সার্থকতার আনন্দ খণ্ডিত না হয়, এইটুকুই আজ আমাদের হৃদয়ের আন্তরিক কামনা। ভাগ্য দেবী প্রসন্না হোন, সুপ্রসন্না হোক মানসী-মানা।

———